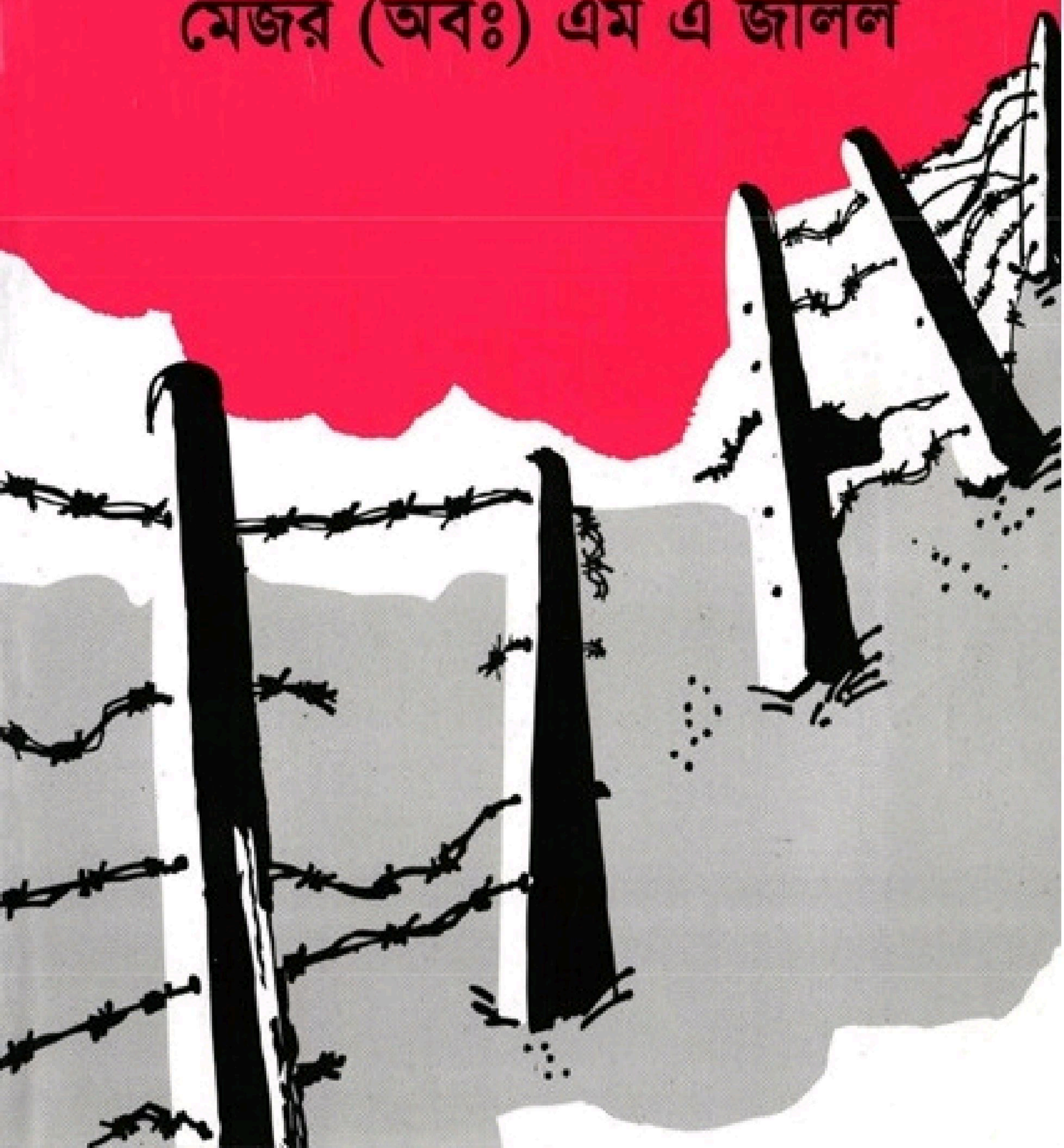
অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা

মেজর (অবঃ) এম এ জলিল



অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা

মেজর (অব.) এম. এ. জলিল

অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা

- মেজর (অবঃ) এম এ জলিল

প্রকাশক

ইতিহাস পরিষদের পক্ষে
এফ. রহমান
ছোট বলি মেহের
সাভার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর-১৯৮৮

অষ্টম প্রকাশ

জুলাই- ২০০৯
শ্রাবণ -১৪১৬
রজব- ১৪৩০

নির্ধারিত মূল্য : ৩০ .০০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

উৎসর্গ -

আমার পরম শ্রদ্ধেয়া

জননীকে

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

মেজর এম. এ. জলিল এ দেশের একজন সাহসী মানুষের নাম। তাঁর কথা ভাবলেই এক দেশপ্রেমিক যোদ্ধার ছবি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। সৈনিক জীবন তাঁকে কেবল সাহসীই বানায়নি, তিনি ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু ও সুশৃঙ্খল একজন মানুষ। আর মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে করেছিল লড়াকু। সুদীর্ঘ ১৩ বছর জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটি লক্ষ্যকে নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। আমৃত্যু সংগ্রামী জীবন তাঁকে করেছিল প্রতিবাদী, জালিম-শোষক ও লুটেরা শাসনের বিরুদ্ধে আপোষহীন। অবশেষে চিন্তার পরিবর্তন ও ইসলামের মূল ধারায় প্রত্যাবর্তন তার মধ্যে পূর্ণতা এনেছিল।

এই প্রসঙ্গে মেজর জলিল নিজেই বলেছেন, 'মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছে সত্য এবং মুক্তি অনুসন্ধানের আজন্ম পিপাসা। আমি সেই পিপাসায় কাতর হয়েই জাসদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। এটা আমার অক্ষমতা বলে বিবেচিত হতে পারে, তবে আমি আমার অক্ষমতার জন্য মোটেই বিব্রত নই।....... আমার জীবনের লক্ষ্য আজ স্থির– আমার লক্ষ্য অর্জনে আমি অটল। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা আমার স্বভাব নয়। এটাই একজন মুসলমানের প্রকৃত সীফাত।'

এই অকুতোভয়, দেশপ্রেমিক এবং নিজকে মুসলমান হিসেবে ঘোষণা দেয়ার সাহসী মানুষটির জীবনের বিভিন্ন বাঁক সম্পর্কে জানার কৌতুহল সবার। বিশেষ করে তরুণদের কাছে মেজর জলিল এক বিস্ময়কর চরিত্রের নাম। আমরা এখানে মেজর জলিলের জীবন প্রবাহের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরলাম।

১৯৪২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী বরিশাল জেলার উজিরপুর থানা সদরে মামার বাড়িতে মেজর জলিলের জন্ম। পিতা- জনাব আলী মিয়া; মাতা- রাবেয়া খাতুন।

তার জন্মের তিন মাস আগে পিতা আলী মিয়া মারা যান। এতিম হয়ে মেজর জলিল জন্ম নেন। জন্মের শুরু থেকে তিনি জীবনের কঠোরতার মুখোমুখি হন। মায়ের স্নেহ-ভালবাসাই ছিল তার জীবন চলার পথের একমাত্র পাথেয়।

১৯৬০ সালে মেজর জলিল উজিরপুর ডব্লিউ. বি. ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেন। স্কুল জীবনেই তিনি নিজেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। ঐ সময় তিনি 'পথের কাঙাল' ও 'রীতি' নামে দুটি উপন্যাস লেখেন। দুর্ভাগ্যজনক হলো, পরে উপন্যাসের পান্ডুলিপি দু'টি হারিয়ে যায়।

১৯৬১ সালে জলিল ইয়াং ক্যাডেটে ভর্তি হন। রাওয়ালপিন্ডির মারিতে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে পাকিস্তানের কাবুলে সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কমিশন লাভ করেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক বাহিনীতে যোগ দেন। ঐ বছর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ১২নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার হিসেবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৬৬ সালে মেজর জলিল পাকিস্তান সামরিক একাডেমি থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি মুলতান থেকে ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রি নেন। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পড়াশুনার প্রতি তার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সামরিক বাহিনীর লোকজনের মধ্যে সাধারণত এমনটি খুব কমই দেখা যায়।

অসুস্থ মাকে দেখতে এক মাসের ছুটি নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী তিনি দেশে আসেন। কিন্তু এই সময় তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা টলটলায়মান অবস্থা বিরাজ করছিল। ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন এই মানুষটি রাজনীতির শেষ অবস্থাটার শেষ দেখার অপেক্ষায় থাকেন।

২৫ মার্চের কালোরাত- পাকিস্তানের ইতিহাসে গোটা চেহারাটাই পাল্টে দেয়। ২৬ মার্চ থেকেই মেজর জলিল মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে নিজেকে নিয়োজিত

করেন। ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত বরিশাল পটুয়াখালিকে তিনি মুক্ত অঞ্চল হিসেবে রাখতে সক্ষম হন।

শুরু হলো মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের জীবন। ৭ এপ্রিল মেজর জলিল খুলনা রেডিও সেন্টার মুক্ত করতে অপারেশন চালান। ২১ এপ্রিল অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের পথ ধরে ভারতে যান। ফিরে এসে ৯নং সেক্টরের প্রধান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী এক লড়াইয়ের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নেয়।

১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর বরিশালে মেজর জলিলকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ২১ ডিসেম্বর বরিশাল হেমায়েত খেলার মাঠে এক বিশাল জনসভায় তিনি ভাষণ দেন। এই দু'টি জনসভায় এতো বেশি স্বতঃস্ফূর্ত জনতা উপস্থিত হয়েছিল যা বরিশালবাসী তার আগে আর কখনো দেখেনি।

স্বাধীনতার পরপর ভারত বাংলাদেশকে কার্যত একটি প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সম্পদ ও পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করে ভারতে নিয়ে যেতে থাকে। যশোরে এমন একটি লুটের মাল বয়ে নেয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়ি বহরকে বাধা দেয়ায় ৩১ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় মেজর জলিলকে বন্দী করা হয়। যশোর সেনানিবাস অফিস কোয়ার্টারের একটি নির্জন বাড়িতে তাকে আটকে রাখা হয়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী।

পাঁচ মাস ছয় দিন বন্দী থাকার পর ১৯৭২ সালের ৭ জুলাই মেজর জলিল মুক্তি লাভ করেন। সেক্টর কমান্ডারদের সবাকেই নানান উপাধি দেয়া হলেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। '৭২'র ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে তিনি রাজনীতিতে নামেন। মেজর জলিলের রাজনীতিতে নামার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা পরবর্তীতে তিনি এই দেশের রাজনীতির অনেক পটপরিবর্তনে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখেন।

১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশালের বাকেরগঞ্জ উজিরপুরসহ

৫টি আসনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে তাঁর বিজয় ছিল নিশ্চিত। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাধর দল আওয়ামী লীগ তাঁকে বিজয়ী হতে দেয়নি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত শেখ মুজিবের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিলেন মেজর জলিল।

১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশ গুলি করলে বেশ কয়েকজন নিহত হয়। মেজর জলিল নিজেও আহত হন। আওয়ামী লীগ সরকার তাকে গ্রেফতার করে। ১৯৭৫ সালে ৮ নভেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও মেজর জলিল ক্ষমতাসীনদের রোষানল থেকে রেহাই পাননি। ১৯৭৫ সালে ২৩ নভেম্বর তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। সামরিক ট্রাইবুনালে কর্নেল তাহের ও মেজর জলিলের ফাঁসি হয়। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য মেজর জলিলের মৃত্যুদন্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।

প্রায় সাড়ে চার বছর কারাভোগের পর ১৯৮০ সালের ২৬ মার্চ তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে তিনি টাঙ্গাইলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা সায়মা আকতারকে বিয়ে করেন। সায়মা জলিল দম্পতির দুই কন্যা সারাহ্ জলিল ও ফারাহ্ জলিল।

এরপর থেকেই মেজর জলিলের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৪ সালের ৩ নভেম্বর তিনি জাসদ থেকে পদত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'কৈফিয়ত ও কিছুকথা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"দলীয় জীবনে জাসদের নেতা-কর্মীরা ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়ার ফলে নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবক্ষয় ঘটে, ব্যক্তিজীবনে আসে বিশৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় নৈতিকতা এবং মূল্যবোধে পরিচালিত সমাজদেহ থেকে নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও সমাজে বসবাসরত জনগণকে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সাংস্কৃতিক জীবন এবং মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে মোটেও সক্ষম হয়নি। প্রচলিত পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারা থেকে কেবল নিজেদেরকে

বিচ্ছিন্ন করে রাখলেই বিকল্প সংস্কৃতি জন্ম নেয় না, বরং এই ধরনের রণকৌশল অবলম্বন সমাজে প্রচলিত নীতি, নৈতিকতা, আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি তাচ্ছিল্য, উপহাস এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, যা প্রকারান্তরে বিপ্লবী আন্দোলনের বিপক্ষে চলে যায়।

"ইসলাম ধর্ম এ দেশের শতকরা ৯০ জন গণমানুষের কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসই নয়, ইসলাম ধর্মভিত্তিক নীতি-নৈতিকতা, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পর্ব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং এদেশের সাধারণ গণমানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটনার সাথে ইসলাম ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত। জন্মপর্ব থেকে শুরু করে জানাযা পর্যন্ত ইসলামের নীতি-নির্দেশের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন। এমন একটি জীবন দর্শনকে অবহেলা, উপেক্ষা কিম্বা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলার নীতিকে বাস্তবসম্মত কিম্বা বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। প্রগতিশীল আন্দোলনের স্বার্থেই ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন অত্যাবশ্যকীয় বলে আমি মনে করি, কারণ ইসলাম শোষণ-জুলুম, অন্যায়, অসুন্দরসহ সর্বরকম স্বৈরশাসন এবং মানুষের উপর অবৈধ প্রভুত্বের ঘোর বিরোধী। ইসলাম পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, রাজতন্ত্র উচ্ছেদের নির্দেশ দেয়। সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ইসলামে নিষিদ্ধ, কারণ সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই। মানুষ হচ্ছে তার কেবল প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমানতদার বা কেয়ার টেকার।"

জাসদ থেকে পদত্যাগের পর মাত্র ১৬ দিন পর মেজর জলিল ১৯৮৪ সালের ২০ অক্টোবর 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' নামে একটি দল গঠন করেন। এই সময় তিনি মরহুম হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালে জানুয়ারী মাসে তাঁকে গৃহবন্দী করা হয়। তিনি এক মাস গৃহবন্দী অবস্থায় থাকেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে ১৯৮৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৮'র মার্চ পর্যন্ত সরকার তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকে রাখে। এর আগে মেজর জলিল লিবিয়া, লেবানন, ইরান, ব্রিটেন ও পাকিস্তানে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৮৮ সালের ১১ নভেম্বর মেজর জলিল পাকিস্তান যান। ১৬ নভেম্বর রাজধানী ইসলামাবাদে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। ১৯ নভেম্বর রাত সাড়ে ১০টায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ২২ নভেম্বর তাঁর লাশ ঢাকায় আনা হয় এবং পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য মেজর (অব) জলিলই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যার লাশ দাফনের মাধ্যমেই মিরপুরের মুক্তিযোদ্ধা গোরস্থানে সর্বপ্রথম লাশ দাফন শুরু হয়েছে।

মেজর জলিল এমন কিছু গ্রন্থ লিখে গেছেন যা আমাদের জাতীয় জীবনের যে কোনো সন্ধিক্ষণে দিক-নির্দেশনার কাজ করবে। তাঁর একটি গ্রন্থ 'অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা' তো এখন দেশপ্রেমের এক বলিষ্ঠএবং উচ্চকিত শ্লোগানে রূপান্তরিত হয়েছে।

মেজর জলিলের লেখা ৮টি গ্রন্থ হলোঃ ১. সীমাহীন সমর (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ডায়রি), ২. মার্কস্‌বাদ (প্রবন্ধ), ৩. সূর্যোদয় (রাজনৈতিক উপন্যাস), ৪. কৈফিয়ত ও কিছু কথা (প্রবন্ধ), ৫. দাবী আন্দোলন দায়িত্ব (প্রবন্ধ), ৬. দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন দর্শন (প্রবন্ধ), ৭. অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা (প্রবন্ধ) ও ৮. A Search for Identity (Essays)

মৃত্যুর সময় মেজর (অব) এম এ জলিল মাতা, স্ত্রী ও দুটি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

ভূমিকা

শতাব্দী থেকে শতাব্দী বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ তাদের স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠানসহ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে এসেছে। এই সহাবস্থানমূলক বসবাসের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ গড়ে তুলেছে সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য। তবে যুগে যুগে এই ভূখণ্ডের জনগণ বিদেশী শাসক-শোষকদের হাতে শোষিত, নিপীড়িত এবং লুণ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসক-শোষকদের সুদীর্ঘ দু'শো বছরের শোষণ এখনো অনেকের স্মৃতিতে দুঃস্বপ্নের মতই জেগে আছে। একইভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং জালেম জমিদারী প্রথার মাধ্যমেও নিষ্পেষিত হয়েছে এই ভূখণ্ডের শান্তিপ্রিয় জনগণ। সর্বশেষে, ভারত বিভক্তি এবং তারই ফলশ্রুতিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জন।

ব্রিটিশ রচিত ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো বহাল রেখে পাকিস্তানের উঠতি পুঁজিবাদী গোষ্ঠী বিশেষ করে সামরিক এবং বেসামরিক আমলা গোষ্ঠী এই অঞ্চলের জনগণের উপর বিমাতাসুলভ আচরণ এবং শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। যার ফলে এই অঞ্চল থেকে যায় অনগ্রসর, অবহেলিত এবং নিগৃহীত। নিগৃহীত জনগণের অভাব-অনটন, হতাশা ও বিক্ষোভ ক্রমশই পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে ধূমায়িত হতে হতে ১৯৭১ সনে একটি প্রবল আগ্নেয়গিরির মতই উদগীরণ ঘটে। এই উদগীরণই পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নেয়। ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা সংগ্রাম হচ্ছে বাঙালী জাতির ধারাবাহিক মুক্তি আন্দোলনেরই একটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয় রূপ। যুগ যুগ ধরে বাঙালী জাতি দেশী-বিদেশী শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়াই করে এসেছে– কখনো করেছে সংঘবদ্ধভাবে, কখনো বা বিচ্ছিন্নভাবে। কিন্তু এই

জাতির বিকাশের ইতিহাসে কোনকালেই সংগ্রামী জনগণ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়নি। নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের মধ্যে লালিত মুক্তিপাগল বাঙালী জাতি সর্বযুগেই শোষকদের কবর রচনা করে এসেছে এবং আন্দোলনের ধারা রেখেছে অব্যাহত।

১৯৭১ সনের সমস্ত গণ-অভ্যুত্থান ছিল একটি যুগান্তকারী গৌরবময় অধ্যায়। এ অধ্যায় রচনা করতে অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার শিকার হতে হয়েছে জাতিকে। প্রাণ দিয়েছে লক্ষ লক্ষ দামাল সন্তান, তাজা রক্ত ঝরেছে অঢেল, ইজ্জত নষ্ট হয়েছে অগণিত মা-বোনের। স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা-মুক্তি। দেশ শত্রুমুক্ত হলে এ দেশে কায়েম হবে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। খাদ্যে-বস্ত্রে দেশ হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে। গড়ে উঠবে স্বাধীন জাতির পুঁজি। মানুষের মান-সম্মান এবং জান-মালের থাকবে নিশ্চিত নিরাপত্তা। দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে আইনের শাসন। মর্যাদার দিক থেকে সকল জনগণই হবে মর্যাদার অধিকারী, কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন। বাঙালী জাতি বিশ্বের মানচিত্রে ঠাঁই লাভ করবে একটি সুখী, স্বাধীন, সমৃদ্ধ সার্বভৌম জাতি হিসেবে। এ সবই তো ছিল সকলের আন্তরিক কামনা-বাসনা। কিন্তু স্বাধীনতা হাতের মুঠোয় পেয়েও যেন আমরা ঠিক পেলাম না।

আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভের প্রায় ১৭ বছর পরেও আমাদের কোন অভাব তো দূর হলোই না বরং যত দিন যাচ্ছে ততই যেন জাতি হিসেবে আমরা মর্যাদাহীন হয়ে পড়ছি, নিস্তেজ হয়ে পড়ছি। বুক ভরা আশা, স্বপ্ন আজ রূপান্তরিত হয়েছে গ্লানি আর হতাশায়। সম্মান, জাতীয়তাবোধ, মর্যাদাবোধ, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ এ সব কিছুই যেন বিধ্বস্ত। এক কথায়, বিবেক আজ বিভ্রান্ত। সুবিধাবাদ এবং অযোগ্যতার মহড়ায় গোটা জাতি আজ নীরব-নিশ্চল, অসহায়, জিম্মী।

আমাদের স্বাধীনতা যেন দেশের সম্পদ, বেপরোয়া লুণ্ঠনেরই উন্মত্ততা। আজ বিদেশীরা নয়, আমরাই যেন আমাদের শত্রু। যে জাতির ললাট একদিন স্বাধীনতার লাল সূর্যে ঝিলমিলিয়ে উঠেছিল, সেই উদ্দীপ্ত ললাটই আজ কালিমার আবরণে অন্তরীণ এবং অভিশপ্ত।

এই অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্য কে বা কারা দায়ী? আজ সকলের বিরুদ্ধেই সকলের একঘেয়ে অভিযোগ। বিগত ১৭ বছরে যারাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তারাই দেশ-জাতিকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করেছে।

দেশ ও জাতিকে নিজেদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত জমিদারী হিসেবে ব্যবহার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। এ ব্যাপারে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের তো জুড়িই নেই। তবে কেউ যেন কারো চেয়ে কম নয়। লুণ্ঠন আর দুর্নীতির নির্লজ্জ প্রতিযোগিতার মহড়াই চলেছে কেবল।

ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাচ্যুত শাসকমহলসমূহের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগের নাটক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে আজ অপরাধী এবং আসামীদের চেহারা অত্যন্ত পরিষ্কার। দেশের দশ কোটি মানুষ অপরাধী কিংবা আসামী নয়। সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া একটি জাতি কখনই আসামী হতে পারে না। আমাদের জনগণ জ্ঞানী-গুণী এবং সাহসী। তবে দোষ-ক্রটি যে আমাদের মধ্যে মোটেও নেই তাও নয়। জাতিগতভাবে আমাদের দোষক্রটির খতিয়ান নেয়ার সময়ও আজ দ্বারপ্রান্তে। বিগত ১৭ বছরে বেশ কয়েকটি সরকার দেশ পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়েছে। কেউ নিয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে আর কেউ বা নিয়েছে বন্দুকের মাধ্যমে।

কারচুপিমূলক নির্বাচন আর ষড়যন্ত্রমূলক বন্দুকের নলের মাধ্যমে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কেউই এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। মুখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরার শপথ নিলেও স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রত্যেকটি সরকারই কার্যত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্মূল করার লক্ষ্যেই বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে জেগে ওঠা বাঙালী জাতির জাগ্রত বিবেক এবং শক্তিকে ভীতির চোখে দেখেছে, প্রীতির চোখে নয়। বিদেশী প্রভুরাও দেখেছে একই চোখে। শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করার অগ্নিশপথপুষ্ট চেতনার নামই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করা কিছু জমি, বাড়ী, টাকা-পয়সা, তাদের কিছু পদোন্নতি, গড়ে তোলা

লাল ইটের কিছু স্তম্ভ। ব্যস! মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা রক্ষাকারীদের জীবন ধন্য। এ ভাবে চলেছে মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনা লালনকারীদের নাটক। এই জাতির উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে ব্যক্তি, দলীয় এবং গোষ্ঠীর স্বার্থে অতি নির্দয়ভাবে ঠেলে দিয়েছে বিলাসের পথে, ধ্বংসের পথে। গণ-মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং বাসস্থান এ সবের কোন বিহিত না করেই শাসকগোষ্ঠীসমূহ আত্মমগ্ন রয়েছে নিজস্ব ভোগ-বিলাসে।

অন্নহীনের হাহাকার, বস্ত্রহীনের সলজ্জ চিৎকার, রুগ্নের আর্তনাদ, গৃহহীনের ফরিয়াদ এবং নিরক্ষরদের হা-হুতাশ কোন সরকারের কর্ণগোচর হয়নি। আজো হচ্ছে না। অথচ অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে শাসক এবং তাদের দোসরকুলের। তাদের মিথ্যাচার এবং প্রতারণা জাতিকে ভীতিজনকভাবে করেছে কলুষিত। বিচারের নামে প্রহসন ন্যায়-নীতির কাঠামোকে ধসে দিয়েছে। এ সব কিছুর ফলেই একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের 'প্রাণকেন্দ্র' মরহুম জনাব শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতার ঘোষক বলে পরিচিত জনাব জিয়াউর রহমান উভয় রাষ্ট্রপ্রধানই অস্বাভাবিক পরিণতির শিকার হয়েছেন। তাঁরা তাঁদেরই সৃষ্ট সমস্যার আবর্তে লুপ্ত হয়েছেন। তাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন না টেনে এ সত্যটি আজ নির্দ্বিধায় আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, দেশ ও জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতাই উভয় নেতার অস্বাভাবিক তিরোধানের অন্যতম কারণ। তবে তাদের হত্যার বিচারের দাবীও উঠেছে। কিন্তু কে করবে আজ কার বিচার? এ দেশে আজো তো কায়েম হয়নি বিচারের শাসন। তাই কে বা কারা রাষ্ট্র প্রধানদ্বয়কে খুন করেছে এবং এ খুনের বিচার হলো কি হলো না এ প্রশ্নটি অমীমাংসীতই থেকে যাবে যতদিন না এ দেশে আইনের শাসন কায়েম হয়। কিন্তু 'খুনের বিচার চাই', 'রক্তের প্রতিশোধ চাই' এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে ধাঁচের রাজনীতি জন্ম দেয়া হচ্ছে, সে রাজনীতি পারবে কি সমস্যা জর্জরিত দেশের দশ কোটি মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান দিতে?

শাসক-শোষক এবং রাজনীতির প্রতি জনগণ আজ চায় তাদের মৌলিক সমস্যার সমাধান। ব্যক্তিপূজা জাতিকে মুক্তি প্রদান করে কিনা সে প্রশ্নটি

আজ অতীব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে সৃষ্ট 'মুজিব' শুধু মুজিবই ছিলেন না, ছিলেন '৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দীপ্ত প্রতীক। ব্যক্তি মুজিবের তিরোধান প্রতীক মুজিবকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। যার যতটুকু প্রাপ্য তা আগামী দিনের ইতিহাসই নির্ধারণ করবে।

যে দেশে হাজারো মায়ের প্রাণপ্রিয় যুবক সন্তানেরা কেবল বস্তাবন্দী হয়ে খালে-বিলে-নদীতে ভেসেছে, যে দেশে বিনা বিচারে শত শত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর সিপাহীদেরকে রাতের আঁধারে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে, ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক বীর নায়ক-অধিনায়ককে, সে দেশে সত্যিকার বিচার ব্যবস্থা কায়েম হোক এটাই তো সকলের ঐকান্তিক কামনা। আইনের শাসনের অবর্তমানে গত দেড় যুগ ধরে এ জাতির রক্ত ঝরেই চলেছে, সমান গতিতে চলেছে নারী-ধর্ষণ নির্যাতন। বিচার নেই, আছে শুধু হাহাকার-কান্না। এই ন্যায় বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আজ প্রয়োজন সাহসী দুর্বার গণ-জাগরণ। শোষণমূলক আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে আইনের শাসন বলতে যা বুঝায় তা কেবল শাসকগোষ্ঠীর জন্যই আইন লঙ্ঘন এবং আইন অপপ্রয়োগ করার বেশুমার ক্ষমতা। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন জনগণকে প্রশাসনমুখী করে তোলে, প্রশাসন এ অবস্থায় কখনো জনমুখী হয় না। প্রশাসন জনশক্তির বিকাশ সাধনে ব্রতী নয়, জনশক্তিকে অসহায়ভাবে প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল করে তোলাই হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের লক্ষ্য। ক্ষমতায় বসে কেবল ফরমান জারী করলেই প্রশাসনের চরিত্র গণমুখী হয়ে ওঠে না। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে জনগণকে মুক্তির আশ্বাস দান জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতারই শামিল। এ সত্যটি অনুধাবন করার মত জ্ঞান প্রত্যেকটি সরকারেরই ছিল। ছিল না শুধু এই প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করে গণমুখী ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সদিচ্ছা। তাই সত্য আজ দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে, বিগত ১৭ বছরে গঠিত সরকারসমূহ সুপরিকল্পিতভাবেই একটি স্বাধীন জাতিকে আত্মবিধ্বংসী পথে ঠেলে দিয়েছে। এ জাতির স্বপ্নিল ভবিষ্যতকে করে তুলেছে অনিশ্চিত ও অন্ধকার। তবে বিগত

সরকারসমূহের ষড়যন্ত্র, অযোগ্যতা এবং ব্যর্থতার ইতিহাস দশ কোটি মানুষের এবং এ জাতির অনাগত ভবিষ্যতের ইতিহাস হতে পারে না। বিপুল সম্ভাবনাময় এ জাতির ললাটে স্থায়ী কলঙ্কের ছাপ লেপন করে দেয়ার অধিকার কারো নেই এবং এমন অধিকার কাউকে দেয়াও যায় না। স্বাধীনতাত্তোর শাসকদের ব্যর্থতার পাশাপাশি এসে যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের দুঃখজনক বিভক্তি, সুবিধাবাদ, সংকীর্ণতা এবং ষড়যন্ত্রের লজ্জাজনক অধ্যায়। বিভিন্ন মতবাদের বুলিতে আবদ্ধ দেশের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ সার্বক্ষণিক জনগণের মধ্যে বিচরণ করলেও কার্যত কোন সংগঠনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নয় বিধায় দেশ ও জাতিকে যুগোপযোগী দিক-নির্দেশনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রচলিত রাজনীতি বুলিসর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যর্থতা থেকে কোন সংগঠনই মুক্ত নয়। পুনঃপুন সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো নতুন জীবন লাভ করেছে। অপরদিকে, রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ যেমন পড়েছে বিপাকে, তেমনি শিকার হয়েছে বিভিন্ন প্রলোভনের। ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে বহু সংখ্যক নেতা ও কর্মী হারিয়েছে রাজনৈতিক চরিত্র। জনসেবা ও প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েও কার্যত তারা প্রচলিত কাঠামোর আওতায় বন্দী হয়ে পড়েছে। ধারাবাহিক আত্মনিবেদিত রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সার্বিক মুক্তির প্রশ্নটি জনগণের কাছে আজ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

রাজনীতির এই দুঃখজনক পরিণতি দেশ ও জাতির জন্য সুখের খবর তো নয়ই, বরং ভয়াবহ অমঙ্গলের হাতছানি। এই অবস্থার কারণেই আজ জাতি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সাহস ও বিবেক হারিয়ে ফেলেছে প্রায়। জুলুম, নির্যাতন, মেশিনগান, ট্যাংক যে জাতির যাত্রাপথকে করতে পারেনি রুদ্ধ, সেই জাতিটিই আজ অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া জাতিটিকে আজ মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে কতো অপবাদ 'তলাবিহীন ঝুড়ি', 'মিসকিন দেশ', 'বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ' আরো কতো কি। মুক্তিযুদ্ধে ঝরানো তাজা রক্তের বিনিময়ে এটাই কি ছিল এ জাতির প্রাপ্য? ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতো

মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারালো, শহীদ হলো, পঙ্গু হলো, হলো নিখোঁজ তার যেমন নেই সঠিক কোন পরিসংখ্যান, তেমনি স্বাধীনতা উত্তর বিগত ১৭ বছরে আরো কতো শত সহস্র যোদ্ধা যে মিথ্যা খুন-চুরি-ডাকাতির অভিযোগে কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে, মরেছে অনাহারে, শিকার হয়েছে গুপ্ত ও প্রকাশ্য হত্যার, ঝুলেছে ফাঁসিকাষ্ঠে তারও নেই কোন হিসেব। যেন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এদেশের মানুষকে বিশেষ করে দামাল যুবশক্তিকে বেহিসাব নির্মূল করার 'ব্লুপ্রিন্ট' নিয়ে।

স্বাধীনতার পর থেকেই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সংগঠন মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের দাবীতে সোচ্চার এবং প্রত্যেকটি সরকারের মুখেই তাদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি ধ্বনিত হলেও মূলত মুক্তিযুদ্ধের নামে স্বাধীন বাংলাদেশে বিশেষ কিছু ব্যক্তি, শ্রেণী ও গোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে সবরকম সুযোগ-সুবিধা ভোগের মাধ্যমে নব্য ধণিক শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রতিযোগিতায় বেপরোয়াভাবে মত্ত। এদেরকে নাম ধরে চিহ্নিত না করলেও সমাজদেহের প্রতি স্তরেই এদের কুৎসিত চেহারা আজ সুস্পষ্ট। জাতির বীর মুক্তিযোদ্ধারা আজ উপহাস কৌতুক ও করুণার পাত্র। ভাবখানা এমন যেন মুক্তিযোদ্ধারা ছিল এক শ্রেণীর কামলা যাদের কাজ ছিল হানাদার বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশীয় কিছু অসৎ সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেয়া। সবরকম মানবিক, সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েও তারাই হবে দেশের প্রভু এবং মুক্তিযোদ্ধারা থাকবে তাদেরই বাধ্যগত কামলা। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আজ একটা কথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখতে হবে যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয়া জাতির মুক্তিযোদ্ধারা কারো দ্বারা পুনর্বাসিত হয় না, বরং মুক্তিযোদ্ধারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়। তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে তারাই সমাজের পুরাতন কাঠামো ভেঙে দিয়ে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে সমাজের শোষিত-নিগৃহীত শ্রেণীসমূহকে পুনর্বাসন করে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রশ্নে ব্যাপারটি ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের চিৎকার সদিচ্ছার চিৎকার নয়, এটাই হচ্ছে প্রকৃত পাওনাদারকে তার প্রাপ্য থেকে প্রতারণা করার এক

গভীর ষড়যন্ত্র। সমাজে পুনর্বাসন প্রয়োজন কাদের? সমাজের পঙ্গু, অনাথ, আতুর, বেকার ভিক্ষুক, পতিতা ইত্যাদি অবহেলিত এবং অক্ষম শ্রেণীর প্রয়োজন পুনর্বাসন।

সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির জন্য বিজয় আনয়নকারী বীর যোদ্ধারা কোনদিনই পুনর্বাসনের পর্যায়ে পড়ে না। মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের সমতুল্য কোন বিনিময় নেই। তাদের গৌরবময় অম্লান ত্যাগে কেবল তারাই পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে না, দেশ-জাঁতিও হবে পুনর্গঠিত। যে জাতির যোদ্ধারাই পুনর্বাসনের স্তরে নেমে যায়, সে জাতির পুনর্গঠন তো দূরে থাক, তাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বই হয়ে পড়ে বিপন্ন। জাতির বীর যোদ্ধারাই যদি হয়ে পড়ে করুণার পাত্র, করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, সে জাতির সাধারণ জনগণের ভোগান্তি আর দুর্দশার যে কোন সীমাই থাকে না, তা আজ আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেই স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। অথচ এই '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধই বাঙালী সত্তাকে বিশ্ববাসীর দরবারে নতুন আঙ্গিকে সুপরিচিত করেছে।

'ভেতো' এবং 'ভীতু' হিসেবে পরিচিত বাঙালী অতীতের সকল অপবাদ ঝেড়ে-মুছে ফেলে একটি সক্ষম যোদ্ধা জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। রক্তক্ষয়ী বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ ও জাতি এই গৌরবের আসন অধিকার করেছে। এ গৌরবের অংশীদার সমগ্র জাতি। এ গৌরব কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা কোন দল বিশেষের নয়। এমন একটি ঐতিহ্যময় গৌরবকে যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা কোন রাজনৈতিক দল কিংবা মুক্তিযুদ্ধে সহকারী কোন দেশ বা জাতি নিজের একক কৃতিত্বের দাবীদার হয়, তখনই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ কেবল বিতর্কিত হয়ে ওঠে না, জনমনেও মুক্তিযুদ্ধ স্পর্কে জন্ম নেয় নানারূপ সংশয় এবং সন্দেহ। মূলত বাস্তবে ঘটেছেও তাই। মুক্তিযুদ্ধ উত্তরকালে তদানীন্তন শাসক গোষ্ঠীর প্রতারণা, নিপীড়ন এবং শোষণমুখী শাসন, মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী বলে কথিত প্রতিবেশী ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর বাংলাদেশের জনগণের প্রতি 'বিগ ব্রাদার'সুলভ আধিপত্যবাদী আচরণ মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে কেবল ম্লানই করেনি, করেছে বিকৃত এবং কলঙ্কিত।

মুক্তিযুদ্ধের ৯নং সেক্টরে সাবেক কমান্ডার হিসেবে বিগত ১৭ বছর আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার অকাল মৃত্যু, গুম ও খুন। নির্মূল ও বিরান হয়ে গেছে তাদের সাজানো-পাতানো সংসার। স্বাধীনতা অর্জনের দাবীদার আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতার ঘোষক বলে কথিত জিয়া সরকারে আমলেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই মুক্তিযোদ্ধারা হয়েছে নাজেহাল। মুক্তিযুদ্ধের পরে মুক্তিযোদ্ধারাই হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের চরম শত্রু। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি একই হয়ে থাকে, তাহলে এই দুঃখ ও লজ্জাজনক বিভক্তি, শত্রুতা এবং নিধন প্রক্রিয়া কেন? তাহলে এই মুক্তিযুদ্ধের পেছনে আসল রহস্যটা কী? প্রাণপ্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোনেরা ও শ্রদ্ধেয় দেশবাসী আসুন না একটু তলিয়ে দেখি।

মুক্তিযুদ্ধপূর্ব তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান

আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবীভিত্তিক নির্বাচনে ব্যাপক বিজয় লাভ সমগ্র জাতিকেই উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৭০ সনের সেই নির্বাচনী ফলাফল বাঙালী জাতীয়তাবাদেরই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল আমার কাছে। সেদিন আওয়ামী লীগের বিজয় জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসী নয় এবং আওয়ামী লীগ বহির্ভূত এদেশের বুদ্ধিজীবী, আমলা, সেনাবাহিনী, পুলিশ, ই.পি.আর, আনসারসহ সাধারণ জনগণও আওয়ামী লীগের বিজয়ে অভূতপূর্ব উল্লসিত হয়েছিল। সে মুহূর্তে আওয়ামী লীগ অতি সার্থকভাবেই জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারণ এবং লালন করেছিল। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে, ক্ষেতে-খামারে, অফিস-আদালতে, হাটে, ঘাটে, মাঠে, নদীতে-সাগরে এমনকি বিদেশ-বিভূঁয়ে বসবাসরত প্রত্যেকটি বাঙালীর বুক জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বেলিত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। আমরা বিহারী নই, আমরা নই পাঞ্জাবী, আমাদের পরিচয় 'আমরা বাঙালী' এই চেতনাবোধে জাগরিত হয়ে উঠেছিল বাঙালীর মন ও প্রাণ। এর ব্যতিক্রম ছিল কেবল তারাই, যারা '৭০-এর সেই ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত হয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল। তারা আওয়ামী লীগের বিজয়ে খুশী তো হতে পারেইনি, বরং শঙ্কিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তখন থেকেই তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়ের পেছনে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কারসাজি ছিল। অনেকে এ কথাও প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তির সময় যে সকল হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে গিয়েছিল তাদের বেশ একটা সংখ্যা বর্ডার পাড়ি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের পক্ষে

ভোট প্রদান করার জন্য চলে আসে। এটা সত্য কি মিথ্যা তা জানা নেই। স্বাধীনতার এত বছর পরে ঐ ধরনের একটি অভিযোগ শুনতে অনেকের কাছেই আজগুবি মনে হলেও, ব্যাপারটি আজ পর্যন্ত তলিয়ে দেখা হয়নি, কিংবা দেখার তাকিদও বোধ করেনি কেউ। আদৌ এমনটি হয়েছিল কি না। হলে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়েছিল, না পূর্ব পরিকল্পিত? এ ধরনের পরিকল্পনার পেছনে উদ্দেশ্য কি ছিল– শুধুই কেবল আওয়ামী লীগের বিজয়কে নিশ্চিত করা না আরো সুদূরপ্রসারী কিছু? এটা কি তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেরই মগজের খেলা ছিল, না আওয়ামী নেতৃত্বও এ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল? স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও আমার মত একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ প্রশ্নগুলো নিভৃতে উঁকি-ঝুঁকি মারে এ কারণেই যে, ২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারল? কোন্ সাহসে কিংবা কোন্ আস্থার উপর ভর করেই বা তারা দলে দলে ভারতের মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল? তাহলে কি গোটা ব্যাপারটাই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত? তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থী দলগুলোর শঙ্কা এবং অনুমান সত্য ছিল? তাদের শঙ্কা এবং অনুমান যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে দেশপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না রাজাকার-আলবদর হিসেবে পরিচিত তারা? এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার হাতে নয়, সত্যের উদঘাটনই কেবল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ধারণ করবে। উত্তর যা-ই হোক, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার চিরদিনেরই দাবী থাকবে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা– আমিই সাচ্চা দেশপ্রেমিক। অন্যায়কে আমি ঘৃণা করতে শিখেছি, অন্যায়কে আমি চিরদিনই ঘৃণা করব। নির্যাতিত মানবতার পাশে আমি দাঁড়িয়েছি বলে আমি গর্বিত। আমার গর্ব খাটো করার অধিকার কারো নেই। ষড়যন্ত্রের কালোহাত আমি দেখিনি, আমি দেখেছি গণহত্যা। তাই রুখে দাঁড়িয়েছি হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে।

কারো পূর্ব পরিকল্পনা খতিয়ে দেখার সময় আমার ছিল না। আমার সম্মুখে ছিল দায়িত্ব, আমি তা কেবল পালন করেছি। যুদ্ধের মাধ্যমে মানবতার সেবা

কতটুকু হয়েছে জানি না, তবে অপরাধীদের মোকাবিলা আমি সক্ষমভাবেই করেছি। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হিসেবে আমি নিপীড়িত ছিলাম। সেনাবাহিনীতে আমাকে ভেতো বাঙালী বলে উপহাস ও কৌতুক করা হতো। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পরে আমি ব্যক্তিগতভাবে দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে হাতেখড়ি না থাকলেও আমি চেতনাহীন ছিলাম না। বাঙালীর জীবনের দুঃখ-কষ্ট আমাকে ভাবিয়ে তুলতো, বাঙালী-বিহারী, বাঙালী-পাঞ্জাবী দ্বন্দ্ব আমাকে পীড়া দিত। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য আমাকে লাঞ্ছিত করতো। তাই '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার অবিকাশিত সত্তার মুক্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। সত্য অনুসরণে আমার নিষ্ঠা থাকলেও প্রতিহিংসার অনল আমাকে অহরহ দহন করেছে। এ অনল আমি জ্বলতে দেখেছি প্রত্যেকটি সাধারণ বাঙালীর বুকে। এই প্রতিহিংসার দাবানল বিস্ফোরিত হলো আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের মধ্য দিয়ে। বিহারী তাড়াও, পাঞ্জাবী তাড়াও এক কথায় অবাঙালী পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাড়াও এই চেতনাটি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিকশিত হতে লাগল। সত্তরের শেষ এবং একাত্তরের শুরুর সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনগণের মাঝে বিজাতীয়দের চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হলেও ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ মোটেও পরিলক্ষিত হয়নি, অথবা ধর্মহীনতা আমাদের পেয়ে বসেনি। তৎকালীন সময়ে কট্টর আওয়ামী লীগার বলে পরিচিত নেতা-কর্মীদের মুখে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নাম গন্ধও শুনতে পাইনি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দামাল তরুণ-যুবকদের অধিকাংশই ছিল এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সন্তান-সন্ততি। যুদ্ধের রক্তাক্ত ময়দানেও আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেছি বাকায়দা নামায পড়তে, দরূদ পাঠ করতে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শাসককুল পবিত্র ইসলাম ধর্মকে বিভিন্ন সময়ে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করেছে বিধায় তাদের বিরুদ্ধে সচেতন জনগণ সোচ্চার ছিল বটে, তবে প্রকাশ্যে পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি কোন মহলই ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেনি। ইসলাম ধর্মের বিষয়টি আমি এখানে এ কারণে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ইসলাম এবং

মুক্তিযুদ্ধের পরের ইসলাম– এর মধ্যে হঠাৎ করে এমন কি ঘটে গেল যাতে ইসলামের কথা শুনলেই কোন কোন মহল পাগলা কুকুরের মত খিঁচিয়ে উঠেন। যে দেশের শতকরা নব্বই জনেরও অধিক পবিত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারী, সে দেশে এ করুণ উন্মাদনার মধ্য দিয়ে ধর্মের নিকুচি করা কি আদৌ যুক্তিসম্মত? এই দুঃখজনক এবং লজ্জাকর অধ্যায়ের জন্য দায়ী কে বা কারা? বাস্তবতার অস্বীকৃতিই প্রতিক্রিয়াশীলতা নয় কী? অপরদিকে বাস্তবতার স্বীকৃতিই প্রগতির শর্ত এবং দাবী নয় কী? তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভেই বর্তমান বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মুক্তিযুদ্ধের এক খোঁচায়ই কি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে? এটা কি কারো খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল, না বাস্তব-নির্ভর? আমাদের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, আমাদের জাতীয় জীবনকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করতে সক্ষম। সত্যানুরাগই কেবল আমাদের মুক্তির দিশারী হতে পারে অন্যথায় আমাদের ধ্বংসের জন্য আমরাই যথেষ্ট। এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে সন্নিবেশিত করা হবে।

সশস্ত্র গণবিস্ফোরণ

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাঙালীদের যেমন উৎসাহিত করেছিল, তেমনি পাকিস্তানী শাসক-শোষকগোষ্ঠীকে করে তুলেছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর 'পিপল্‌স পার্টি' এবং পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় অঞ্চলের জনগণই যে স্পষ্ট রায়টি দিয়েছিল তা ছিল 'আর এক রাষ্ট্র নয়, আমরা দু'টি ভিন্ন রাষ্ট্র, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ এবং চাহিদা ভিন্নতর। উভয় দেশের জনগণের রায়ই যেন দুই দেশের জন্য দু'টি ভিন্ন পতাকা রচনার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিল। আর তাই তো মিঃ ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ অধিবেশনে যোগদান করতে সরাসরিই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। শুধু কেবল তাই-ই নয়, তাঁর পিপল্‌স পার্টির কোন সদস্য যদি সেই সংসদ অধিবেশনে যোগদানের লক্ষ্যে ঢাকায় আসে, তাহলে সে সকল সংসদ-সদস্যদের পা ভেঙে দেয়া হবে বলেও হুমকি প্রদান করলেন। এদিকে তৎকালীন সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান বার বার সংসদ অধিবেশনের বৈঠক আহ্বান করেও অধিবেশন বসাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। বেশ কয়েকবার বৈঠকের তারিখ পরিবর্তন করা সত্ত্বেও সংসদ অধিবেশন হলো না। ঢাকা থেকে লাহোর গমনের এক পর্যায়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে বিজয়ী নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে করমর্দন করতে করতেই শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও উল্লেখ করে ফেলেছিলেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হলো '৭০-এর ডিসেম্বরেই, কিন্তু এদিকে ফেব্রুয়ারী মাস অতিবাহিত হয়ে মার্চ

মাসের প্রথম সপ্তাহ চলছে। মার্চের নির্ধারিত সংসদ অধিবেশন বসলো না। ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে চরম উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় বাঙালী বিহারী সংঘর্ষের সূত্রপাত দেখা দিল। বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় গোটা জাতি হয়ে উঠলো বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর এবং প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার ছাপ দেশের আনাচে-কানাচে, আকাশে-বাতাসে বিদ্যমান হয়ে উঠল। সর্বস্তরের জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল একটি প্রিয় নাম 'মুজিব'। বাউলের একতারায় শুনেছি তাঁর নাম, মাঝির গাওয়া ভাটিয়ালীতে শুনেছি তাঁর নাম, বস্তাটানা কুলী-মজুরের কণ্ঠে শুনেছি তাঁর নাম, কিষাণের ভাওয়াইয়ায় ফুটে উঠেছে তাঁর নাম। সেকি আলোড়ন সারা দেশব্যাপী, সে কি হিন্দোল। এ যেন ছিল মহাসাগরেরই উত্থানের মত দিকে দিকে ভরপুর সে। 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' শ্লোগানটি যেন তৎকালীন বাস্তবতার সাথে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল। 'মুজিব' জাতীয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু এবং একমাত্র প্রতীক-এ পরিণত হলেন। এই 'প্রতীকটিই' বাঙালীর সশস্ত্র গণবিস্ফোরণের প্রথম উপাদান হিসেবে পরিণত হয়ে গেল। মুজিবের কণ্ঠই তখন যে কোন সশস্ত্র শক্তির তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে পড়ল। তাঁর নির্দেশে জাতি তখন যে কোন শক্তির মোকাবিলা করার মত মানসিকতা অর্জন করল। এখানেই মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-আন্দোলনের চরম সার্থকতা। একটি কণ্ঠই যখন সমগ্র জাতিকে সশস্ত্ররূপে সজ্জিত হওয়ার সাহস জোগায় সে জাতিকে পরাভূত করার শক্তি তখন আর কারোর থাকে না। ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ ঢাকা রেস কোর্সে দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের সেই জাদুকরী কণ্ঠে যে ভাষণ প্রচারিত হলো, তার মধ্য দিয়েই মূলত পূর্ব পাকিস্তানের সমাধি রচনা এবং আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা লগ্ন ঘোষিত হয়ে যায়। 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম', 'তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়– ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'

উপরিউক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়েই বস্তুতপক্ষে বাঙালীদের জন্য স্বাধীনতা

যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে গেছে। আমি যদি বলি উপরিউক্ত বক্তব্য প্রদানের মধ্য দিয়েই শেখ মুজিব একজন জাতীয়তাবাদী নেতার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের চূড়ান্তরূপ ঘোষণা করে দিয়ে তাঁর শেষ দায়িত্ব সার্থকভাবেই সমাপ্ত করেছেন, তাহলে মোটেও ভুল হবে না। বস্তুত তাই একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নেতার চরম পাওয়াই হচ্ছে তাঁর জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের মানসিকতা দিয়ে সজ্জিত করা। সেদিক থেকে মুজিব অনেকাংশেই সফল।

তবে এখানেই আর একটি প্রশ্ন জাগে। জাতির জন্য স্বাধীনতা অর্জনই যদি শেখ মুজিবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে ৭ই মার্চের অমন জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদানের পরে তিনি কি করে শত্রুপক্ষের সাথে বৈঠকে বসার আশা পোষণ করেছিলেন? পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল সামরিক সরকার প্রধান ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণার পরে পুনরায় শেখ মুজিব কেন বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন? স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণাকারী শেখ মুজিবের কি ধরনের প্রত্যাশা ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে? যার যা আছে তাই নিয়ে জাতিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করার পরে কোন ভরসায় জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আপোসরফার আলোচনার টেবিলে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন? তাহলে কি শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাননি? তিনি কি চেয়েছিলেন পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে পৌঁছতে? জাতিকে চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য নির্দেশ দিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোন ত্যাগের প্রস্তুতি না নিয়ে ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত কেনই বা শত্রুপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন? এখানেই খুঁজতে হবে মুজিবের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণ। তাঁর নেতৃত্বের সংকট স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে এখানে। একটি জাতীয়তাবাদী আন্দালনের চূড়ান্ত পর্যায়ই হচ্ছে স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং তেমন একটি ঐতিহাসিক পর্বে নেতৃত্ব দানের লোভ এবং মোহ থাকলেই নেতা হওয়া যায় না। শ্রেণীগত দুর্বল চরিত্রের কারণে শেখ মুজিবের মধ্যকার দোদুল্যমানতা এবং সংশয়ই তাঁকে স্ববিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত করেছে।

তাই 'স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'মুক্তির সংগ্রাম' এ ধরনের মন্তব্য করতে যেমন তার বাধেনি, তেমনি বাধেনি মুক্তির সংগ্রাম ঘোষণা করার পরেও শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য অপেক্ষা করতে। দেশের তখনকার বাস্তব অবস্থা স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষেই ছিল। তাই তখনকার ছাত্র নেতৃত্বের চাপেই শেখ মুজিব ৭ই মার্চ ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' এ ধরনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি প্রকাশ্যে বলেও ফেলেছিলেন, "আমি যদি আপনার কথা মত কাজ করি, তাহলে ছাত্র নেতারা আমাকে গুলী করবে, আর যদি আমি ছাত্র নেতাদের কথামত চলি তাহলে আপনি আমাকে গুলী করবেন, বলুন তো এখন আমি কি করি।" শেখ মুজিব তাঁর নেতৃত্বের অসহায় এবং করুণ অবস্থাই ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর উপরিউক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। তবে সংগ্রামী ছাত্র নেতৃত্ব এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই দু'য়ের মাঝখানে আর যে ঘটনাটি বিদ্যমান ছিল তা হলো বাঙালী জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে সচেতনতা। শেখ মুজিব একদিকে ছাত্র নেতৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করে স্বাধীনতার পক্ষে যেমন কাজ করেছেন, ঠিক তেমনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে। শেখ মুজিবের এই স্ববিরোধী ভূমিকার জন্য ইতিহাস একদিন তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

তবে শেখ মুজিবের এই স্ববিরোধী ভূমিকার জন্য জনগণের যুদ্ধ থেমে থাকেনি। ১৯৭১ সনের সেই ভয়াল ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানী বাহিনীর হিংস্র বর্বরদের মতন নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরোধের বারুদ জ্বলে উঠেছিল। সে অবস্থায় নিরস্ত্র বাঙালীদের সশস্ত্ররূপ ধারণ করতে সময় লাগেনি। মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়তেই যেমন আক্রমণকারী নিজেই অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি সেদিন ঘটেছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ভাগ্যে। গণ-আন্দোলন অবশেষে রূপান্তরিত হলো সশস্ত্র গণ-বিস্ফোরণে। তবে শেখ মুজিবের

অনুপস্থিতি বাঙালীদের জন্য ছিল দুর্ভাগ্য এবং ব্যক্তি মুজিবের জন্য ছিল রাজনৈতিক বিপর্যয়। নেতৃত্বহীন অবস্থায় একটি জাতির সশস্ত্র গণ-বিস্ফোরণ যেমন হতে পারে আত্মবিধ্বংসী, তেমনই তা হতে পারে নিদারুণ বিপজ্জনক। কিন্তু ১৯৭১ সনের সশস্ত্র গণবিস্ফোরণ শেষ পর্যন্ত যে একটি সফল মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিতে সক্ষম হয়েছে, তার কৃতিত্ব কোন একক নেতৃত্বের নয়, সমগ্র সংগ্রামী জনগোষ্ঠীই সে কৃতিত্বের দাবীদার। জনগণের সশস্ত্র বিস্ফোরণই প্রয়োজনের তাকিদে বিকল্প নেতৃত্ব জন্ম দিয়েছে। সশস্ত্র গণ-বিস্ফোরণ যুগে যুগে এভাবেই নতুন নেতৃত্বের জন্ম দিয়ে থাকে।

শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ইদানীং প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা হচ্ছে। বাক-বিতণ্ডার কারণও রয়েছে প্রচুর। একটি নেতৃত্বহীন স্বতঃস্ফূর্ত গণ-বিস্ফোরণকে যে যার মত পুঁজি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সশস্ত্র গণ-বিস্ফোরণটি যে মুক্তিযুদ্ধের রূপ নেবে সে ধারণা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বসহ অনেকেরই ছিল না। ২৫শে মার্চ রাতে পাক হানাদারবাহিনীও ঐ রকম বর্বর হামলা পরিচালনা করবে তেমন ধারণাও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে ছিল না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কোন ধরনের প্রস্তুতিই ছিল না, তাঁদের মনে ছিল কেবল ক্ষমতা দখলের রঙিন স্বপ্ন ও প্রত্যাশা। তাঁরা যখন নির্দ্বিধায় মন্তব্য করেন যে, পাক সেনাবাহিনীর আক্রমণ ছিল আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত, এ ধরনের মন্তব্যই কি প্রমাণ করে না যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ চেতনা ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত?

আওয়ামী লীগের বেশ উচ্চস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মন্তব্য পর্যালোচনা করে দেখলেই ঘটনার সত্যতা বেরিয়ে আসবে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধোত্তরকালে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অনেকের সঙ্গেই আমার কথাবার্তা হয়েছে। ২৫শে মার্চ রাতের কথা স্মরণ করে অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই শিউরে উঠে জবাব দিয়েছেন যে, তাদের নাকি কল্পনায়ও ছিল না পাকিস্তান আলোচনার পথ ত্যাগ করে আক্রমণ করবে। অনেকে মার্শাল ল' জারি হতে পারে পর্যন্ত ধারণা করেছেন।

তবে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের ভাষায় 'তারা কল্পনাও করতে পারেননি পাকিস্তান সেনাবাহিনী অমন বর্বরভাবে আক্রমণ করবে'। উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে এটা অতি পরিষ্কার যে, আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের চেতনায় মুক্তিযুদ্ধের ধ্যান-ধারণার কোন অবস্থানই ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের

বিদ্যমান ধ্যান-ধারণার অধিকারী হলে এ সকল উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণের পর থেকেই সতর্ক হয়ে যেতেন এবং যুদ্ধের জন্য নিদেনপক্ষে মানসিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করতেন। তাঁদের নেতা শেখ মুজিব স্বয়ং যেখানে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন আর সে ক্ষেত্রে প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ সুবোধ বালকের ন্যায় সরলভাবে স্বীকার করেছেন যে, পাক বাহিনী যে ঐ রকম বর্বরভাবে বাঙালীদের উপর হামলা চালাবেন, তা তারা নাকি ভাবতেও পারেননি। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার ঘোষণা হচ্ছে আর সেই দলের নেতারা বিস্ময় প্রকাশ করছেন শত্রুপক্ষের হামলার ধরন দেখে। সত্যি সত্যি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধটা না হয়ে গেলে ব্যাপারটা বেশ কৌতুককরই ছিল বৈকি।

কিন্তু জাতির প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ ঘটে গেছে বলে ঐ সকল নেতাদের দায়িত্বহীনতা, চেতনাহীনতা এবং অপদার্থতাই প্রমাণিত হয়েছে তাদের ঐ ধরনের বিস্ময়বোধ থেকে। এতো গেল আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি নমুনামাত্র।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে বস্তুটি কি এবং কোথায়, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা ব্যাখ্যা কারো কাছেই পাওয়া যায়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধের পরে অনেক মহারথীই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এক এক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়াস নিচ্ছেন। বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় তো আমাদের কম নয়, সুতরাং কোন কিছুর সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে আর কতক্ষণ লাগে। ঘটেছেও ঠিক তাই। যার যার মতন সবাই সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাও দিয়ে যাচ্ছেন। তবে বক্তব্য বিবৃতিতে সবারই এক কথা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করতে হবে।' অতি বিজ্ঞতাসুলভ ভঙ্গীতে সকলেই ঐ এক কথাই আওড়িয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া তো উপায়ও নেই, কারণ এ থেকে সামান্য একটু হেরফের হয়ে গেলেই অমনি প্রমাণিত রাজাকারও একজন মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ দাঁড় করাবে যে, অমুক মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধিতা করেছে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা যে কি এবং কাদের এই চেতনা এ নিয়ে ভয়ে আর কেউ তলিয়ে দেখতে চাচ্ছে না। যাক বাবা! যেমন আছে তেমনই থাক। 'না বুঝে তসবিহর মত জপে যাওয়াটাই শ্রেয়'র মত চিন্তা-

চেতনায়ই আমরা সকলে কমবেশী আক্রান্ত এবং সংক্রামিত। তবে স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিসমূহ আজ প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করার নসীহত যখন করে বেড়ান, তখন একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার সাধ জেগেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে কি ছিল এবং এ চেতনার অধিকারী কারা– মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধারা, না মুক্তিযুদ্ধ বহির্ভূতরা?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সত্যিই কি নির্দিষ্ট কোন রূপরেখা ছিল বা আছে? সেই চেতনার ঐক্যই কি মুক্তিযুদ্ধের ঐক্যের ভিত্তি ছিল? স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে এ সকল তথ্যের প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য না হলেও, আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য তা অবশ্যই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সকল ধরনের সংকীর্ণতা পরিহার করে সততার সাথে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত করার মধ্য দিয়েই কেবল সম্ভব ভবিষ্যত বংশদরদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনা ও চিত্র রেখে যাওয়া। অন্যথায় বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন কালি-কলম আর তুলির আঁচড়ে বিকৃত রূপ ধারণ করতে করতে এক সময় ইতিহাসের পাতা থেকেই বিলীন হয়ে যাবে।

মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি কেবল প্রয়াস চালাচ্ছি প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে। আমার জানা ও বুঝার মধ্যে ভুল-ক্রটি থাকতে পারে, কিন্তু তা হবে আমার অজ্ঞতারই কারণে, অসততার কারণে নয়। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' এর ব্যাখ্যা আমার বর্তমান জ্ঞান ও চেতনার স্তরে পৌঁছে যেভাবে দাঁড় করাই তাতে কিছু যায় আসে না। তবে আজ থেকে ১৭ বছর পূর্বে মুক্তিযুদ্ধকে আমি কোন চেতনায় অনুভব করেছিলাম সেটাই হচ্ছে প্রধান কথা। আমার ব্যক্তিগত চেতনার কথা আমি পরেই বলব, তবে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি যুদ্ধের ময়দানে কর্মক্ষেত্রে এবং আমার বিভিন্ন সংযোগের মাধ্যমে বাস্তবে আমি যা দেখেছি, অনুভব করেছি তা আমি আবেগ-বর্জিতভাবেই এখানে তুলে ধরতে চাই।

মুক্তিযুদ্ধের কোন নির্দিষ্ট চেতনা ছিল না বলে যাদের ধারণা আমার মনে

হয় তারা হয়তো বা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি, না হয় তারা মুক্তিযুদ্ধে কোনরূপ অংশগ্রহণ করা থেকেই বিরত ছিল। অথবা তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ অংশ যারা বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে কিংবা সুবিধা অর্জ্জনের লোভে মুক্তিযুদ্ধে 'নাম কা ওয়াস্তে' অংশগ্রহণ করেছে। অথবা তারা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে সচেতনভাবেই অনুপ্রবেশ করেছিল শত্রুপক্ষকে খবরাখবর দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য।

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নির্দিষ্ট রূপ যে ছিল না তা নয়, তবে সে চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল একটা বিশেষ মহলের মধ্যে এবং তারা হচ্ছে তৎকালীন ছাত্র সমাজের সর্বাধিক সচেতন মহলেরও একটা ক্ষুদ্র অংশবিশেষ– বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সেই অংশটি যার নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্র নেতা সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরিফ প্রমুখ। এই অংশটির চিন্তা-চেতনায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানী চক্র থেকে মুক্ত করে এই অঞ্চলকে বাঙালীর জন্য একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল। এর বাইরে যারা এই অঞ্চলকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সীং), ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ ভাসানীর একটা অংশ, মরহুম সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত কমান্ডার মোয়াজ্জমসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এর বাইরে যে ছাত্র সমাজ বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল তাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিল গতানুগতিক দেশপ্রেমিকদের দায়িত্বস্বরূপ, মুক্তিযুদ্ধের উপরিউক্ত নির্দিষ্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী, পুলিশ, ই.পি.আর, আনসার, অন্যান্য চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি মহলের ক্ষেত্রেও এ কথাই প্রযোজ্য। এদের মধ্যে আবার অনেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে নিতান্তই বাধ্য হয়ে– প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে, কেউ কেউ করেছে সুবিধা অর্জ্জনের লোভ-লালসায়, কেউ করেছে পদ-যশ অর্জ্জনের সুযোগ হিসেবে, কেউ করেছে

তারুণ্যের অন্ধ আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে এবং কতিপয় লোক অংশগ্রহণ করেছে 'এডভেঞ্চারিজম'-এর বশে। এ সকল ক্ষেত্রে দেশপ্রেম, নিষ্ঠা এবং সততারও তীব্র তারতম্য ছিল, কারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও যারা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় এবং যুদ্ধোত্তরকালে চুরি ডাকাতি, ধর্ষণ করেছে, অপর বাঙালীর সম্পদ লোপাট করেছে. বিভিন্নরূপে প্রতারণা করেছে, ব্যক্তি শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছে, তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সেই নির্দিষ্ট চেতনা যে সম্পূর্ণভাবেই অজানা ছিল তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। তবে তাদের মধ্যে মুজিবপ্রীতি ছিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কিংবা আদর্শবোধ ছিল না। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের সংখ্যাই ছিল অধিক। যাদের কাছে কেবল শেখ মুজিবই ছিল চেতনা ও আদর্শের বিকল্প, তারা মুক্তিযুদ্ধের সেই সুনির্দিষ্ট চেতনার অভাবে মুক্তিযুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে অন্ধ আবেগের বশে বিভিন্নভাবে বাড়াবাড়ি করেছে এবং আজ পর্যন্ত করে চলেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকলীন অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের সেই সুনির্দিষ্ট চেতনার ধারাবাহিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি বলেই অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাই জানত না তারা কোন লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে ঐ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা কেবল একটা কথাই জানত– পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীসহ সকল অবাঙালীকেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে দেশকে মুক্ত করতে হবে। পুনরায় বাপ-দাদার ভিটায় স্বাধীনভাবে ফিরে যেতে হবে। এর অধিক তারা আর কিছুই জানত না বা বুঝত না। তারা এ কথাটি জানত না বা বুঝত না যে, কেবল অস্থানীয় শোষকগোষ্ঠী বিতাড়িত হলেই দেশ ও জাতি শোষণহীন বা স্বাধীন হয় না। অস্থানীয় শোষকের স্থানটি যে স্থানীয় শোষক এবং সম্পদলোভীদের দ্বারা অতি দ্রুত পূরণ হয়ে যাবে এ বিষয়টি সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের জ্ঞান বা বোধশক্তির বাইরে ছিল। এ সত্যটি কেবল তারা তখনই অনুভব করল, যখন সদ্য স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করে সরাসরি প্রত্যক্ষ করল শাসক আওয়ামী লীগ এবং তাদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষমতা এবং সম্পদ ভাগাভাগি এবং লুটপাটের দৃশ্য এবং মহড়া। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের সেই সুনির্দিষ্ট চেতনায় যারা সমৃদ্ধ ছিল, তারা যুদ্ধ

চলাকলীন অবস্থায়ই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল আওয়ামী লীগের আচার-আচরণ, দেশে ফিরে কি হবে।

সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ঐ চেতনাধারী সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ স্বাধীনতা-উত্তরকালে আর আওয়ামী লীগের সহযোগিতা করে চলতে তো পারেইনি বরং স্বার্থপর এবং ভোগী আওয়ামী লীগের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর যারা মুক্তিযুদ্ধের ঐ চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল না বা হতেও পারেনি, তারা মুক্তিযুদ্ধের পরে চরমভাবে আশাহত হয়েই বাধ্য হয়েছে যার যার পুরানো সামাজিক অবস্থানে ফিরে গিয়ে অতৃপ্ত আত্মার কেবল পরিতাপই ভোগ করে চলতে। সংখ্যায় তারাই অধিক এবং তাদের সাথে রয়েছে সমস্ত জনগোষ্ঠী, যারা পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের হয় সমর্থক ছিল, না হয় ছিল মুক্তিযুদ্ধের সুফল লাভের বুকভরা আশায় অপেক্ষমান।

এই বিশাল আশাহত জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়ার আবেদন-নিবেদন জানানোর ব্যাপারটি কি সম্পূর্ণই অর্থহীন এবং এক ধরনের প্রতারণা নয়? এই বিশাল জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের ১৭ বছর পরে পুনরায় সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অর্জনের কোন প্রয়োজন বোধ করছে না, কারণ মুক্তিযুদ্ধে তারা তাদের সন্তান হারিয়েছে, পিতা হারিয়েছে, স্বামী হারিয়েছে, মা, বোন, কন্যা এবং স্ত্রী হারিয়েছে, ঘর-বাড়ী এবং সম্পদ হারিয়েছে, হারিয়েছে আরো আরো অনেক কিছু। তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তখনও ছিল না, তাদের মধ্যে ছিল শেখ মুজিবের প্রতি ভালবাসা, বিশ্বাস এবং স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতা ভোগের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা এবং অফুরন্ত আশা। তারা যখন প্রত্যক্ষ করল স্বাধীনতা কেবল শাসক আওয়ামী লীগের লোকজনের জন্যই ভোগ এনেছে, তাদের জন্যে নয়, তখন তারা রাতারাতিই আওয়ামী লীগ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, কারণ যেখানেই প্রত্যাশা, সেখানেই হতাশা। এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় যারা আওয়ামী লীগের ঘোর সমর্থক ছিল, তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে যখন দেখল আওয়ামী লীগই তাদের ভিটে-ভূমি 'শত্রু-সম্পত্তি'র নাম দিয়ে দখল করে নিচ্ছে, তখনই আওয়ামী লীগ সম্পর্কে তাদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে।

বেকার ছাত্র-যুবক যখন দেখল স্বাধীনতা তাদের যোগ্য স্থান কিংবা কর্ম-সংস্থান করতে ব্যর্থ হচ্ছে, শিক্ষক যখন দেখল স্বাধীনতা তাঁর মান-মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছে না, বুদ্ধিজীবীরা যখন দেখল সমাজে তাদের মূল্য নেই, সেনাবাহিনী যখন দেখল স্বাধীনতা তাদের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হচ্ছে না, তখনই কেবল তারা নিজ নিজ মানসিকতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাখ্যা প্রদান করা শুরু করল। এ দোষ বা ব্যর্থতা তাদের নয়, এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী সমাজের সেই সচেতন অংশই, যারা যুদ্ধের সময় ব্যাপক জনগোষ্ঠী এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ঐ চেতনা উপস্থাপন করতে অপারগ হয়েছে।

তাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, সমর্থন কিংবা সহযোগিতা করলেই কেবল মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধা প্রকৃতপক্ষে তারাই কেবল হতে পারে, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিপুষ্ট।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যারা পরিপুষ্ট ছিল, তাদের মধ্যে হতাশা নেই। তাদের মধ্যে রয়েছে নবতর সংগ্রামের তীব্র যাতনা-দাহ।

মুক্তিযুদ্ধের জনক হিসেবে পরিচিত মরহুম জনাব শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে অবগত থাকলেও সেই চেতনায় তিনি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই ক্ষমতালাভের পরে তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে মারাত্মক দ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতা, যার ফলে তিনি কখনো হয়েছেন রাষ্ট্রপতি আবার কখনো দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীত্বের। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যেও তদ্রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে দোদুল্যমানতা এবং সীমাহীন ক্ষমতা-সম্পদ লাভের মোহ। তারা সকলেই কেবল ক্ষমতার সখ মিটিয়েছে কারণ মুক্তিযুদ্ধ তাদের কাছে ছিল কেবল ক্ষমতা লাভের হাতিয়ার মাত্র, চেতনার উৎস নয়।

এর বাইরে রয়েছে জনগোষ্ঠীরই আর একটি বিরাট অংশ যারা আদর্শগত ভাবে পাকিস্তানের পক্ষে থেকে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছে। এদের কাছে সেই '৭১-এও যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোন মূল্য ছিল না, আজও তেমন নেই। এরা বরং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে কথিত

শাসক গোষ্ঠীর ব্যর্থতা অবলোকনের পরে নিজস্ব যুক্তি, আদর্শ এবং অবস্থানের দিক দিয়ে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থানে বিরাজ করছে বর্তমানে। এমতবস্থায় সমাজের সর্বাধিক সচেতন গোষ্ঠীর কাছ থেকেও যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান হয়, তাতেও দেশের বঞ্চিত জনগণের সাড়া পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়টি এখন আর গবেষণারও বস্তু নয়। যে মুক্তির জাগরণ মানুষকে নিরাশ করেছে, সে মুক্তির আহ্বানে নতুন করে সাড়া না দেওয়াই স্বাভাবিক। মুক্তির নতুন আহ্বান কেবল নতুন চেতনা জাগরণের মাধ্যমেই সম্ভব। সমাজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সীমাবদ্ধ রেখে সেই চেতনাকে মুক্তিযুদ্ধে জনগণের চেতনা হিসেবে আরোপিত করার প্রবণতা এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতারই সামিল। এ ধরনের প্রবণতা না উক্ত চেতনাকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম, না সক্ষম সেই চেতনার পুনঃবিকাশ ঘটাতে। জনগণের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশের খেয়ালী এবং রোমান্টিক চেতনা কোনদিনই বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে জাতীয় চেতনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয় না।

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকৃত অবস্থা

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধবিরতির পর থেকে ১৯৭১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমি পাকিস্তানের মুলতান শহরে ১২ নম্বর ক্যাভালরী রেজিমেন্টে (ট্যাংক রেজিমেন্ট) চাকরীরত ছিলাম। ১৪ই ফেব্রুয়ারী এক মাসের ছুটি নিয়ে ঢাকায় অবতরণ করি। তারপরে বরিশালের উজিরপুর থানায় দেশের বাড়িতে থাকাকালীন অবস্থায় ২৬ মার্চ সকাল ৮টায় আমি বরিশাল শহরে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করি। মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে দেশে আসা সৈনিক দেশ-মাতৃকার দুর্দিনে মায়ের রোগশয্যা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি বৃহত্তর ডাকে সাড়া দিতে। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। তরুণ যুবকদের বুকে প্রচণ্ড আবেগ, উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা- বয়স্কদের চোখে-মুখে ভীতি, অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার উদ্বেগ। শিশু-কিশোরদের চোখজুড়ে সীমাহীন কৌতূহল- নারী সমাজের বুক অজানা উৎকণ্ঠায় প্রকম্পিত। অহরহ মায়ের বুক খালি করে হাজার হাজার তরুণ যুবকরা ছুটে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে। দিকে দিকে বাংলার জননীর অশ্রুসিক্ত চোখের উদাস চাহনিই যেন তাদের ছেলে-সন্তানদের পিছু পিছু দোয়া-আশীর্বাদ নিয়ে ছুটছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি থমথমে। মানুষ কেবল ছুটে চলছে এখান থেকে ওখানে, শহর থেকে গ্রামে। এর মধ্যে রয়েছে তাড়া খাওয়া সেনা, পুলিশ এবং ই.পি.আর বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরাও। এখানে-সেখানে হঠাৎ গুলির শব্দ। তরুণ যুবকরা ট্রেনিং নিচ্ছে এবং তাদেরই সংগে প্রতিনিয়ত যোগদান করে চলছে তাড়া খাওয়া সেই সশস্ত্র সদস্যরা। তাদের চোখে-মুখে আগুন ঠিকরে দেশ স্বাধীন করার অংগীকার সোচ্চারিত হচ্ছে।

বিহারী এবং অবাঙালী অধিবাসীরা প্রাণের ভয়ে এদিক-ওদিক, ঝোঁপজঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কারো সঙ্গে শিশু সন্তান, কারো সঙ্গে যুবতী মেয়ে। প্রাণ এবং

সম্ভ্রম দুটোই বাঁচিয়ে চলতে হবে, অথচ মানব হিংস্রতার মুখে এ কোনটিরই সামান্যতম নিরাপত্তা নেই। বাঙালীর ভয়ে বিহারী পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর বিহারী-পাকিস্তানীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বাঙালী। অথচ কারো সঙ্গে কারো কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, তবু '৭১-এর ২৫শে মার্চের পরে শত্রুতার যেন কোন শেষও নেই। স্বাধীনতার নামে স্বার্থবাদী মহলের ক্ষমতা দখলের উন্মত্ততা ঘর সংসার করা সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের মধ্যে আকস্মিকভাবেই জন্ম দিয়েছে ভয়াবহ হিংস্রতা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের বর্বর নেশা। মানুষ মানুষের মধ্যকার স্বাভাবিক মানবতাবোধভিত্তিক সম্পর্কের ছেদ ঘটেছে, সকলেই যুদ্ধংদেহী।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতে হামলা দিচ্ছে বিভিন্ন শহরে বন্দরে। টার্গেট হচ্ছে তরুণ, যুবক, ছাত্র এবং শ্রমিক সমাজ। সুন্দরী নারীরা বিশেষ টার্গেটরূপে বিবেচিত। শহরের বিভিন্ন ডাকবাংলোগুলোতে বিলাস-অনাচারের জমজমাট পাকবাহিনীর আড্ডা। পচা গলিত লাশের চারিদিকে শেয়াল, কুকুর ও শকুনের ভীড়। রাতের গভীরে নির্যাতিত নারীর বুকফাটা চিৎকার। বধ্যভূমিতে মেশিনগানের ব্রাশফায়ারের ঠা ঠা শব্দ। নদীতে হামলাকারী গানবোটের বিকট উল্লাস। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দলে দলে শরণার্থীরূপে বর্ডারে আহাজারী। ত্বরিতে নৌকায় নদী পাড়ির সময় মাঝ নদীতে নৌকাডুবি- আপনজনদের হাহাকার। পঙ্গু ও অসহায়দের আর্তনাদ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। মুক্তিযুদ্ধ চলছে।

হাট বাজার জমছে না। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাটা। মিল ফ্যাক্টরী, কারখানাগুলো নীরব শূন্য শূন্য। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিগুলো নিস্তব্ধ। অফিস-আদালতগুলো প্রাণহীন। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অনেকেই দেশের অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। কিছু কিছু বর্ডার অতিক্রম করে ভারতে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সেনাবাহিনী থেকে ছুটে আসা তরুণ অফিসারদের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং শিবির। দলে দলে তরুণ ছাত্র যুবকরা যোগ দিচ্ছে ট্রেনিং শিবিরে।

সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ। দেশ শত্রুমুক্ত হবে এটাই তাদের কামনা। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষ হিসেবে

চিহ্নিত হয়ে গেছে। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে স্থাপিত স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র থেকে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভার ঘোষণা করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শেখ মুজিবের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য জনাব তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ বৈদেশিক এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জনাব মনসুর আহমদকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল মোহাম্মদ আতাউল হক ওসমান গণিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রধান সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সনের ১৭ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর থেকে আরো ঘোষণা করা হয় ৯ জন সেক্টর কমান্ডারের নাম। সমগ্র রণক্ষেত্রকে ৯টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং নবম সেক্টরের দায়িত্বভার অর্পিত হয় আমার উপর। প্রায় সমগ্র দক্ষিণ বাংলা নিয়েই গঠিত হয়েছিল এই ৯ নম্বর সেক্টর। বৃহত্তর বরিশাল জেলা, ভোলা, পটুয়াখালী, ফরিদপুর এবং খুলনা সহকারে ৯নং সেক্টর বস্তুতপক্ষে ছিল বৃহত্তম সেক্টর।

এই ঘোষণার সাথে সাথেই এলোমেলো মুক্তিযুদ্ধ একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করল। কোন সেক্টরে আওতাধীন নয় এমনও অনেক স্বাধীন গ্রুপ ছিল যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তৎপর ছিল। এদের মধ্যে টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী এবং বরিশালের একটা অঞ্চলে সর্বহারা পার্টির নেতা সিকদার বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। আরো কিছু বামপন্থী দল তাদের নিজস্ব উদ্যোগেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। তারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেনি। তবে ৯টি সেক্টর ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই পাক বাহিনী অধিকতর সতর্ক এবং সক্রিয় হয়ে পড়ল। হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পেল, মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরবাড়ী পোড়ানো শুরু হলো। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি দানা বাঁধতে লাগল। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি জন্ম নিল পুরাতন মুসলিম লীগ, নেজাম-ই-ইসলাম, জামায়াত-ই-ইসলাম সহ অন্যান্য ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনসমূহ থেকে।

তাদের যুক্তি হলো যে, তারা বাঙালীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়, তবে তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার পক্ষে মোটেও নয়। কারণ হিসেবে তারা মত প্রকাশ করেছেন যে, পাকিস্তানী শাসক-শোষকের শোষণ-যুলুম থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় শাসক-শোষকদের অধীনস্থ হওয়াকে স্বাধীনতা হিসেবে বিবেচনা হওয়ার কোন যুক্তি নেই। তাঁরা ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তিকে পাকিস্তানী আধিপত্যবাদী শক্তির তুলনায় অধিকতর বিপজ্জনক বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মুসলমানদের বাসভূমি সৃষ্ট পাকিস্তানকে কেবল দ্বিখণ্ডিত করতে আগ্রহী নয়, বরং দ্বিখণ্ডিত করার পরে পূর্ব অঞ্চল অর্থাৎ বাংলাদেশকে সর্বতোভাবেই গ্রাস করার হীন পরিকল্পনায়ও লিপ্ত। এমন যুক্তিকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সাধারণ দেশবাসী মনেপ্রাণে মেনে না নিলেও একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেনি, কারণ এ কথা অতীব সত্য যে, এদেশের জনগণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ভারতভীতি বিদ্যমান।

তবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে তাড়া খাওয়া বাঙালী আত্মরক্ষার স্বার্থে '৭১-এর সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে ভারতের বুকেই নির্দ্বিধায় ঠাঁই নিয়েছিল এবং ঠাঁই সেথায় পেয়েছিলও। এই ঠাঁই লাভের পেছনে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ জড়িত ছিল। স্বার্থ ছাড়া কখনো সন্ধি হয় না। বাঙালীর স্বার্থ ছিল ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে দেশ মুক্ত করা, আর ভারতের স্বার্থ ছিল দেশ মুক্ত করার নামে তার চিহ্নিত এবং প্রমাণিত শত্রু পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্য দিয়ে শত্রুপক্ষকে স্থায়ীভাবে দুর্বল করে রাখা এবং মুক্ত বাংলাদেশের উপর প্রাথমিকভাবে খবরদারী করে পরবর্তীতে সময়ও সুযোগমত ভারতের সাথে একীভূত করে নেয়া। এটাকে কেবল তাদের নিছক স্বার্থ হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে, বরং এটা ছিল তাদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন।

১৯৪৭ সনের দেশ বিভক্তির সময় বঙ্গ-ভঙ্গের ইচ্ছা ভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোটেও ছিল না। তাঁরা সমগ্র বাংলাকেই পেতে চেয়েছিলেন ভারতের সঙ্গে, কিন্তু মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ চেয়েছিলেন 'বাংলাকে' একটি পূর্ণ স্বাধীন দেশ হিসেবে দেখতে যা হবে কমনওয়েলথভুক্ত একটি স্বাধীন রাজ্য।

শেরে বাংলা জনাব এ. কে. ফজলুল হক, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবরাও ছিলেন ঐ ধরনেরই স্বাধীন বাংলা রাজ্যের পক্ষে। কিন্তু বাধ সাধলেন কিছু কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শ্রী প্যাটেল বাবু এবং দেশ বিভক্তির একান্ত শেষ মুহূর্তে অজানা কারণে অবশেষে পূর্ববাংলা পশ্চিম বাংলা থেকে বিভক্ত হয়ে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে শামিল হয়ে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ রকম একটি নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়েই বাঙালী জাতি ঐতিহাসিকভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলা এবং হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলা হিসেবে। বাঙালী মুসলমান এবং বাঙালী হিন্দুর মধ্যে ধর্মের তারতম্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই একে অপরের অনেক কাছাকাছি ছিল। যদিও বা উভয়েরই সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার উৎসস্থল ছিল ভিন্ন। ১৯৪৭ সনের দেশ বিভক্তির মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক ছেদ ঘটানো হলো তার সাময়িক অবসান ঘটলো '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। তার বড় প্রমাণ লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে পশ্চিম বাংলায় অনায়াসে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান। পশ্চিম বাংলার বাঙালী জনগণের প্রাণঢালা আন্তরিকতা, আতিথেয়তা এবং ভালবাসা স্নেহশীলা মায়ের কোলকেই কেবল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

পশ্চিম বাংলার আনাচে-কানাচে তাই গড়ে উঠতে পেরেছে শত শত ট্রেনিং শিবির, অসংখ্য শরণার্থী শিবির। রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, বাগানে বাগানে, বাড়ীর বারান্দায় পর্যন্ত ভীড় জমেছে শরণার্থীদের। মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদের সকল ধরনের অত্যাচার নীরবে এবং হাসি মুখে সয়েছে পশ্চিম বাংলার বাঙালী জনগণ। মানবতার এই অপূর্ব নিদর্শন ছিল তুলনাহীন। পশ্চিম বাংলার বাঙালীদের এই মমতাভরা সাহায্য-সহযোগিতার অবর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা এবং লাখো লাখো শরণার্থীরা আদৌ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে টিকে থাকতে পারতো কিনা আমার সন্দেহ।

বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারের প্রথম অফিস ছিল এই পশ্চিম বাংলারই কোলকাতা নগরীর ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে এবং এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের হেডকোয়ার্টার। পশ্চিম বাংলার বর্ডারে বর্ডারে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল

মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবির। আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রতিনিয়ত সাহায্য-সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকার এবং জনগণ বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধকে বিশেষভাবেই করেছে অনুপ্রাণিত। স্বাধীন বাংলা সরকার ঘোষণা করার সাথে সাথেই তো আর সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সনের জুন মাসের পূর্ব পর্যন্ত 'স্বাধীন বাংলা' সরকারের কোন নির্দিষ্ট অফিস পর্যন্ত ছিল না। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে অবস্থিত ভারতীয় বি.এস.এফ-এর অফিস খালি করে জনাব তাজউদ্দীন গঠিত মন্ত্রিসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বসার সুযোগ করে দেয়া হয়। এর পূর্বে এই মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আমি দেখেছি আনুমানিক ৫৬/এ, বালিগঞ্জে অবস্থিত একটি দোতলা বাড়ীর দোতলায় মেসে ভাড়া থাকা বেকার যুবকদের ন্যায় গড়াগড়ি করতে এবং তাস খেলতে। এসব কথা বলতে গেলে আর একটু পেছনে যেতে হয়। বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলসহ আমার সেক্টরের প্রত্যেকটি জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করা, শহর প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদিসহ মোটামুটি প্রস্তুতি গ্রহণের পর্ব প্রায় শেষ। কিন্তু অস্ত্রের দিক দিয়ে যে দুর্বলতা ছিল তা পর্বতপ্রমাণ। কিছু কিছু পুরানো ধাঁচের থ্রি নট থ্রি রাইফেল, কিছু স্টেনগান এবং গ্রেনেড ছাড়া আমার কাছে তেমন আর কিছুই ছিল না। কেবল মনোবল এবং মানসিক প্রস্তুতিই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট নয়, সাথে সাথে আধুনিক সমর অস্ত্রও যুদ্ধ জয়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। অস্ত্র সংকট আমাকে সব সময়েই ভাবিয়ে তুলত। তাই সমগ্র ৯নং সেক্টরকে কয়েকটি সাব সেক্টরে বিভক্ত করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা চালু রেখে আমি একুশে এপ্রিল কয়েকটি মোটর লঞ্চ সহকারে সুন্দরবনের পথ ধরে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। প্রধান লক্ষ্যই ছিল ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা। বরিশাল সদর থেকে নির্বাচিত জনপ্রিয় সংসদ সদস্য (প্রাদেশিক) জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ইতিপূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে বরিশাল ফেরত এসে আমাকে জানালেন যে, লেঃ জেনারেল অরোরা ভারতের পূর্ব অঞ্চলীয় সর্বাধিনায়ক এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালী সামরিক অফিসারের কাছে অস্ত্র সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত আছেন। এই তথ্য লাভের মাত্র ১ দিন পরই আমি কিছু

মুক্তিযোদ্ধা সহকারে ভারত অভিমুখে রওয়ানা হয়ে প্রথমে পৌঁছি পশ্চিম বাংলার বারাসাত জেলার হাছনাবাদ বর্ডার টাউনে। ঐ অঞ্চলের বি.এস.এফ-এর কমান্ডার লেঃ কমান্ডার শ্রী মুখার্জীর সঙ্গে হয় প্রথম আলোচনা। কমান্ডার মুখার্জী অত্যন্ত সুহৃদ বাঙালী অফিসার। তিনি সর্বান্তকরণেই আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সরাসরি লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিয়ে গেলেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁর হেড কোয়ার্টার। তিনি আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সাক্ষী-প্রমাণ দাবী করলেন আমার। তখনই আমাকে সদ্য ঘোষিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন এবং সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী সাহেবের নাম নিতে হয়েছে। উত্তরে জেনারেল অরোরা সাহেব আমাদের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে যা বাজে মন্তব্য করলেন, তা কেবল 'ইয়াঙ্কী'দের মুখেই সদা উচ্চারিত হয়ে থাকে। সোজা ভাষায় তার উত্তর ছিল 'ঐ দু'টা ব্লাডি ইঁদুরের কথা আমি জানিনা, ওদের কোন মূল্য নেই আমার কাছে। অন্য কোন সাক্ষী থাকলে বলো।'

মহা মুশকিল দেখছি। এই ভারতের মাটিতে আমার মত একটা নাম না জানা তরুণ মেজরকে কোন দুঃখে কেউ চিনতে যাবে? ব্যাটা বলেটা কি? আমার স্বাধীন বাংলায় প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর প্রথম সর্বাধিনায়ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্পর্কেই যে ব্যক্তি এরূপ কদর্য উক্তি করতে ছাড়েননি, তিনি আমার মত চুনোপুঁটিদের যে কি চোখে দেখবেন, তা অনুধাবন করতেই একটা অজানা আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। অমনি আমি জেনারেল অরোরাকে অতি স্পষ্ট ভাষায় একজন বিদ্রোহীর সুরে জানিয়ে দিলাম যে, আমার অস্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই, আমি শূন্য হাতেই দেশের অভ্যন্তরে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করব তবু তাঁর কাছে আর অস্ত্রের জন্য আসব না। আমার এই বিদ্রোহী ভূমিকায় জেনারেল রীতিমত চমকে উঠেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর সিকিউরিটি এবং ইনটেলিজেন্স-এর লোকদের কাছে হাওয়ালা করেন। চারদিন বন্দী অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, বিশেষ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। আমার দ্রুত মুক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করার লক্ষ্যকে

সামনে রেখেই আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে কিছুটা তথ্য প্রদান করি। পূর্ব অঞ্চলের 'চীফ অফ স্টাফ' জেনারেল জ্যাকব আমার দেয়া তথ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং আমাকে যে কোন ধরনের অস্ত্রপাতি যোগান দেয়ার আশ্বাসও প্রদান করেন। এভাবে কোলকাতার সেই ব্রিটিশ রচিত দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ামের অন্ধকূপ থেকে আমি মুক্তি পেয়ে জনাব তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে যাই।

দেশের সাধারণ শান্তিপ্রিয় জনগণকে হিংস্র দানবের মুখে ঠেলে দিয়ে কোলকাতার বালিগঞ্জের আবাসিক এলাকার একটি দ্বিতল বাড়ীতে বসে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভা সহকারে (খোন্দকার মোশতাক বাদে) নিরাপদে তাস খেলছিলেন দেখে আমি সে মুহূর্তে কেবল বিস্মিতই হইনি, মনে মনে বলছিলাম 'ধরণী দ্বিধা হও'। ধরণী সেদিন দ্বিধা না হলেও আমি কিন্তু সেদিন থেকেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি চরমভাবে আস্থাহীন এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। এর ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য মঙ্গলজনক না হলেও, আমি আমার সকল ক্ষতিকে নীরবে মাথা পেতে নিয়েই আওয়ামী লীগের এই দায়িত্বহীন, উদাসীন এবং সৌখিন মেজাজসম্পন্ন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। দেশ ও জাতির স্বার্থে বাস্তবেও আমি করেছি তাই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসই তার সাক্ষী। যে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ জনগণকে যুদ্ধে লেলিহান শিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বেকার, অলস যুবকদের মত তাস খেলায় মত্ত হতে পারে, সে জাতির দুর্ভাগ্য সহজে মোচন হবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আচরণে এ ধরনের ভূরি ভূরি নমুনা রয়েছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাদের আরাম-আয়েশী জীবনধারা কোলকাতাবাসীদেরকে করেছে হতবাক।

ব্যক্তিজীবন পদ্ধতিতে সীমাহীন ভোগ-লালসার কারণেই আশ্রয়দানকারী ভারত কর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দুর্বলতাসমূহ অতি সহজেই নির্ণীত করে নিয়েছে এবং তাদের ভোগ-বিলাসে কোনরূপ বাধা প্রদান করা থেকে বিরত

থেকেছে। এ ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ঔদার্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উত্তরোত্তর কলঙ্কময় করে তুলতে সহায়তা করেছে। অপরদিকে কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে স্বাধীন বাংলাদেশের অফিস থাকলেও ক্ষমতার সকল উৎসই ছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী সাহেব একজন 'সম্মানিত বন্দীর' জীবন যাপন করা ব্যতীত আর তেমন কিছুই করার সুযোগ ছিল না তাঁর। সেক্টর পরিদর্শন করা তো দূরেরই কথা তাঁর তরফ থেকে লিখিত নির্দেশও তেমন কিছু পৌঁছতে পারতো না সেক্টর কমান্ডারদের কাছে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মুক্তি যোদ্ধাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করার আগ্রহ প্রদর্শন যা করেছে তার তুলনায় অধিকতর উৎসাহ এবং আগ্রহ প্রদর্শন করেছে তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র প্রদান নয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে জরুরী তথ্য সংগ্রহই ছিল যেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এ ধরনের আচরণই তাদের গোপন লালসা পূরণের 'নীল নকশা' তৈরি করার ইঙ্গিত প্রদান করেছে। আমার এ সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়নি।

ভারতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবির

২৫শে মার্চের পাকিস্তানী হামলার পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলো পাকিস্তানী বাহিনীর অব্যাহত হামলার মুখে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা হামলার ধারা পরিচালনা করতে করতে এক পর্যায়ে বর্ডার অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে থাকে। অপরদিকে হাজার হাজার তরুণ ছাত্র যুবক দলে দলে ছুটে যেতে থাকে ভারতে। এভাবেই গড়ে ওঠে ভারতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবির।

মে মাসের শেষের দিকে তরুণ-যুবকের দল ভারত অভিমুখী হয়ে ওঠে। এর পূর্বে তেমন কোন প্রাণ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়নি। এই মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি প্রথম ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করি ইছামতি নদীর ভারতীয় পাড় ঘেঁষে হাছনাবাদ বন্দরে, হিংগলগঞ্জে এবং ধীরে ধীরে ট্রেনিং শিবির সম্প্রসারিত হতে হতে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত সর্বমোট ১১টি শিবিরে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বশীরহাট মহকুমার সর্বত্রই ট্রেনিং শিবিরগুলো ছড়িয়ে ছিল। জুন-জুলাইয়ের মধ্যে হাজার হাজার তরুণ যুবকের প্রচণ্ড ভীড় জমতে থাকে। সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের বর্ডার এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের তীর্থস্থানে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। যে কোন তীর্থযাত্রীদের তুলনায় তারা ছিল ত্যাগী এবং নিবেদিত। একেবারেই সহায় সম্বলহীন। কারো সঙ্গে অতি সামান্য পুঁটলি, কারো সঙ্গে কেবল লুঙ্গী-গামছা, কারো তাও নেই। অধিকাংশ যুবকই কেবল প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসেছে। পথিমধ্যে পাকিস্তানী বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রক্তভেজা কাপড়ে, আহত দেহ নিয়ে কোনমতে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে পশ্চিম বাংলার বর্ডার এলাকায়। শত্রুর অব্যাহত তাড়া, অর্ধাহার-

অনাহারে একটানা পথ চলার মধ্য দিয়ে এ সকল তরুণ জন্মভূমির ভিটে-মাটি ছেড়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় এসে গড়িয়ে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের তীর্থস্থান পশ্চিম বাংলায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মায়াজালে আত্মসমর্পণ করেছে তারা অত্যন্ত অনিশ্চিতভাবেই। অপূর্ব সে দৃশ্য, অতুলনীয় সে আত্মসমর্পণ। যুগভেরীর অদৃশ্য আহ্বানের সাড়া দিয়েছে একটি জাতির যুব চেতনা। জাগ্রত চেতনার এই লেলিহান শিখা বিশ্বের যে কোন স্বৈরশক্তির ভিত পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে সমর্থ, সে তথ্য আমি ইতিহাসের পাতায় বহুবার পড়েছি। তাই তরুণ-যুবকদের ভীড় যত বৃদ্ধি পেতে লাগল, ততই আমি আশাবাদী হয়ে উঠলাম মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সম্পর্কে। মনে-প্রাণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে শুরু করলাম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে। তারা যদি অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা না বাড়িয়ে দিত, তাহলে পূর্ব বাংলার তরুণ সমাজ মুক্তিযুদ্ধে ততটা সাড়া দিত কিনা সে সন্দেহ অনেকের মাঝেই আছে। একটি ঘুমন্ত জাতিকে বেয়নেটের খোঁচায় জাগিয়ে তোলার জন্য হানাদার বাহিনীর কৃতিত্ব একেবারে কম নয়। ভেতো বলে ঘৃণিত একটি জাতি রাতারাতি যে কোন 'মার্শাল রেস' বা যোদ্ধা জাতির ন্যায় সগর্বে দাঁড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কেবল আহাম্মকই বনে যায়নি, দারুণভাবে ভীত-সন্ত্রস্তও হয়ে পড়েছিল। বাঙালী জাতির ইতিহাসই যে হচ্ছে যুদ্ধের ইতিহাস সেকথা জানা থাকলে হানাদার বাহিনী বেয়নেট নিয়ে খোঁচাতে যেত কিনা সন্দেহ। কারণ একটা জাতি কেবল বেয়নেটের আচমকা খোঁচাতেই রাতারাতি যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়ে যায় না, যুদ্ধের চেতনার সক্রিয় উপস্থিতিই একটি জাতিকে যোদ্ধা জাতি হিসেবে আত্মবিকাশলাভে সহায়তা করে। পাকিস্তানী বাহিনীর আচমকা আক্রমণ বাঙালী জাতির আত্মবিকাশের ধারাকে কেবল ত্বরান্বিত করেছে। আর তাই তো তীর্থযাত্রীদের ন্যায় ছুটেছে তরুণ-যুবক অস্ত্রের সন্ধানে। বর্ডার অতিক্রম করতে সক্ষম হলেই ট্রেনিং ক্যাম্পের সন্ধানলাভ, সুতরাং 'চলো চলো, বর্ডার চলো' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে দিন-রাত ছুটে চলেছে মুক্তিপিপাসু কিশোর, তরুণ, যুবক। মায়ের স্নেহের বাঁধনের চেয়েও নিরাপদ মনে হয়েছে অস্ত্র শিক্ষা। তাই সকল স্নেহের বাঁধন

ছেড়ে যেতে দেরী হয়নি, তেমনি দেরী হয়নি অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করতে।

মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করা বাঙালী তরুণ ক্যাপ্টেন, মেজর পদের অফিসার দিয়েই শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে নন কমিশনড্ অফিসার নায়েক এবং হাবিলদাররাও প্রশংসাজনক উদ্যোগ নিয়ে ট্রেনিং শিবিরগুলো অতি কষ্টে দাঁড় করিয়েছে। কোন উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশ ব্যতিরেকেই এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবির স্থাপনের ব্যাপারে কোন ধরনেরই অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। এই ট্রেনিং শিবিরগুলোই মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়ার ক্ষেত্র 'নিউক্লিয়াস' বা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। এই কৃতিত্বের দাবীদার ঐ সকল দেশপ্রেমিক বাঙালি আর্মি অফিসার এবং ব্যক্তিবর্গ, যারা সবরকম ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের 'নিউক্লিয়াস' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের খানিকটা ভূমিকা থাকলেও তা আশানুরূপ ছিল না। তবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এমনকি পশ্চিম বাংলার নিরাপদ এলাকায় ট্রেনিং শিবির গড়ে ওঠার পরেও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ট্রেনিং শিবিরের আশেপাশেও দেখা যায়নি। তবে এর ব্যতিক্রম যারা ছিলেন তাদের সংখ্যা সীমিত।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে অনেকে বলে থাকেন যে, 'বেচারারা' বিচ্ছিন্নভাবে যেভাবে যে পেরেছে বর্ডার অতিক্রম করার ফলে পশ্চিম বাংলায় গিয়ে এক রকম কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায়ই এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করেছেন দীর্ঘদিন। তাদের নাকি নিজেদেরই কোনরূপ অবস্থান ছিল না, কি করেই বা যুদ্ধের খবর নেবে? কথাগুলোতে বেশ যুক্তি আছে, তবে অতটা জোরালো নয়। 'বেনিফিট অব ডাউট' বা 'সন্দেহের সুযোগ' নিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যে মোটেও কার্পণ্য করেননি তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছি যখন তাদেরকে দেখেছি কোলকাতার অভিজাত এলাকার হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোতে জমজমাট আড্ডায় ব্যস্ত।

একাত্তরের সেই গভীর বর্ষণমুখর দিনরাতে কোলকাতার অভিজাত রেস্টুরেন্টগুলোতে বসে গরম কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে হাঁটুতক কাদা জলে ডুবন্ত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলোতে অবস্থানরত হাজার হাজার তরুণের বেদনাহত চেহারাগুলো তারা একবারও দেখেছে কি না তা আজও আমার জানতে ইচ্ছে করে। আমার জানতে ইচ্ছে করে কোলকাতার পার্ক স্ট্রীটের অভিজাত নাইট ক্লাবগুলোতে বীয়ার হুইস্কি পানরত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মনোমুকুরে একবারও ভেসে উঠেছে কি না সেই গুলীবিদ্ধ কিশোর কাজলের কথা যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার করে ঘোষণা করেছে 'জয় বাংলা'। আমার জানতে ইচ্ছে করে আরো আরো অনেক কিছু। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করলেই তো আর জানা যায় না।

ভারতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অনেক কিছুই জানতে চেয়েছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং চিত্র নির্মাতা কাজী জহির রায়হান। তিনি জেনেছিলেন অনেক কিছু, চিত্রায়িতও করেছিলেন অনেক দুর্লভ দৃশ্যের। কিন্তু অতসব জানতে বুঝতে গিয়ে তিনি বেজায় অপরাধ করে ফেলেছিলেন। স্বাধীনতার উষালগ্নেই তাঁকে সেই অনেক কিছু জানার অপরাধেই প্রাণ দিতে হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। ভারতের মাটিতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চুরি, দুর্নীতি, অবৈধ ব্যবসা, যৌন কেলেঙ্কারী, বিভিন্ন রকম ভোগ-বিলাসসহ তাদের বিভিন্নমুখী অপকর্মের প্রামাণ্য দলীল ছিল– ছিল সচিত্র দৃশ্য। আওয়ামী লীগের অতি সাধের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজী জহির রায়হানের এতবড় অপরাধকে স্বার্থান্বেষী মহল কোন যুক্তিতে ক্ষমা করতে পারে? তাই বেঁচে থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী রূপ দেখে যাওয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজীবেরও ঘটেছিল এই পরিণতি। এই দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান, তেজোদীপ্ত যুবক স্টুয়ার্ড মুজীব আমার ৯নং সেক্টরের অধীনে এবং পরে ৮নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছে। তার মত নির্ভেজাল ত্বরিতকর্মা একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা সত্যিই বিরল। প্রচণ্ড সাহস ও বীরত্বের অধিকারী স্টুয়ার্ড মুজিব ছিল শেখ মুজীবের অত্যন্ত প্রিয় অন্ধভক্ত। মাদারীপুর থানার অন্তর্গত পালং

অধিবাসী মুজিবকে দেখেছি বিদ্যুতের মতই এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটোছুটি করতে। কি করে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করা যায়, ভারতের কোন নেতার সাথে যোগাযোগ করলে মুক্তিযুদ্ধের রসদ লাভ করা যায় কেবল সেই চিন্তা এবং কর্মেই অস্থির দেখেছি স্টুয়ার্ড মুজিবকে। মুজিব ভারতে অবস্থিত আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেক কুকীর্তি সম্পর্কেই ছিল ওয়াকিফহাল। এতবড় স্পর্ধা কি করে সইবে স্বার্থান্বেষী মহল? তাই স্বাধীনতার মাত্র সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ঢাকা নগরীর গুলিস্তান চত্বর থেকে হাইজ্যাক হয়ে যায় স্টুয়ার্ড মুজিব। এভাবে হারিয়ে যায় বাংলার আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ভারতে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলোও ছিল নানান কুকর্মে লিপ্ত আওয়ামী নেতৃত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই সচেতনভাবেই তারা ট্রেনিং শিবিরগুলো এড়িয়ে চলতো। এ সকল ট্রেনিং শিবিরে অবস্থান করত সাধারণ জনগণের সন্তান, যাদের ভারতের অন্যত্র কোন ধরনের আশ্রয় ছিল না। যারা হোটেল কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে তারা আর মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরের ধারে-কাছেও ভিড়েনি, অংশগ্রহণ করা তো দূরেই থাক। এ ধরনের সুবিধাভোগীদের নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে ভারতীয় স্পাই সংস্থা 'র' (RAW) মেজর জেনারেল ওভানের মাধ্যমে 'মুজিব বাহিনী নামে একটি বিশেষ বাহিনী গঠনে হাত দেয়। এই বাহিনীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অবস্থাপন্ন সদস্যরাই কেবল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের ট্রেনিং পরিচালনা করা হয় ভারতের 'দেরাধন' শহরে। তাদের জন্যে বিশেষ সুবিধা এবং আরাম আয়েশের সুব্যবস্থা ছিল। 'মুজিব বাহিনী' গঠন ছিল বাংলার সাধারণ জনগণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধাদের বিকল্প ব্যবস্থা। 'মুজিব বাহিনী' যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাদের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যই বলা চলে যে, সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধে তাদের রক্ত ঝরাতে হয়নি। তাদের অভিজাত রক্ত সংরক্ষিত করা হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত ঝরানোর লক্ষ্যে।

অপরদিকে, সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবিরগুলোর ছিল বর্ণনাতীত

দুরবস্থা। সাধারণত এক হাঁটু কাদাজলে ডোবানো ট্রেনিং শিবিরগুলোতে না ছিল পর্যাপ্ত খাবার, না ছিল বাসোপযোগী কোন ব্যবস্থা। দিনরাত খেটেও তারা পেটপুরে খেতে পায়নি। আধপেটা অবস্থায়ই তাদেরকে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়েছে। সারা দিনে-রাতে দু'বেলা খিচুড়ি জুটে গেলেই সেদিনকে সৌভাগ্য মনে করা হতো। পরিধানে লুঙ্গি গামছাও ছিল এক ধরনের বিলাস। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে কেবল একটা হাফপ্যান্ট, কিংবা লুঙ্গি পরিধান করেই ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। 'মওসুমের' নির্বিচার বৃষ্টির ধারা তাদেরকে সামান্যতম বিশ্রাম পর্যন্ত নিতে দিত না। হাঁটু কাদা মাটিতে মশার অত্যাচার নির্বিচারে সহ্য করে সারারাত দাঁড়িয়ে কাটাতে হতো তাদেরকে। তবু ট্রেনিং গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহে কখনো ভাটা দেখিনি আমি। একটা শিবিরে ৩ থেকে ৪ হাজার মুক্তিযোদ্ধা এক সঙ্গে ট্রেনিং গ্রহণ করতো। প্রত্যেকটি শিবিরই ছিল পরিপূর্ণ। কোন বাধা-বিপত্তি কিংবা কোন অসুবিধেই তাদেরকে অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। অসংখ্য মাসুম কিশোরকেও দেখেছি সোল্লাসে ট্রেনিং গ্রহণ করতে। কোন দুঃখ কষ্টই যেন তাদের কাছে লজ্জা বা দ্বিধার ব্যাপার ছিল না। দুঃখবোধ তারা কেবল তখনই করত যখন তাদের কম বয়স বিবেচনা করে অস্ত্র ট্রেনিং থেকে বিরত রেখে অন্যান্য কাজে নিয়োগ করার চেষ্টা চালান হতো। অস্ত্র শিক্ষা তাদের কাছে ছিল যেন প্রাণের ধন অত্যন্ত গর্বের বস্তু। পশ্চিম বাংলার বর্ডার এলাকায় আমার অধীনে পরিচালিত ১১টি ট্রেনিং শিবিরই ছিল অত্যন্ত জমজমাট। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৪ নম্বর আসামী জনাব সুলতান উদ্দীন আহমদ একজন দক্ষ ন্যাভাল কমাণ্ডো শিক্ষক হিসেবে এই সকল ট্রেনিং শিবিরগুলো সরাসরিভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই পরিচালনা করেছেন। তাঁর হাড়ভাংগা খাটুনীর দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য। ইছামতী নদীর তীরে টাকী শহরের বাকুন্দিয়ায় অবস্থিত ছিল বৃহত্তম ট্রেনিং শিবির। কোন কোন সময় ৫ থেকে ৭ হাজার যুবক এক সঙ্গে ট্রেনিং গ্রহণ করত।

এই সকল শিবির প্রথমে আমার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানেই গড়ে উঠে। প্রথমভাগে ভারতীয় বর্ডার ফোর্স বি, এস, এফ- এর মাধ্যমে কিছু কিছু রসদ এবং খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী 'ব্যাটেল পজিশন' নেয়ার পরে সেনা ইউনিট থেকে রেশন নিয়মিতভাবে দেয়া হতো। কিন্তু সে রেশন ছিল নিতান্তই অপ্রতুল, কারণ দিনরাত চব্বিশ ঘন্টাই শত শত নতুন যুবক ট্রেনিংয়ের জন্য হাযির হতো। সুতরাং প্রাপ্ত রেশন সব সময়েই 'শেয়ার' করে চলতে হতো নবাগতদের সঙ্গে। বেসরকারী এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থাগুলো প্রভূতভাবে সাহায্য করেছে বলে হাজার হাজার যুবক অনাহারজনিত কারণে মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছে। মানবতাবাদী ঐ সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর অবদান অতুলনীয় এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে আমার এখনো অতি স্পষ্টভাবে মনে আছে পশ্চিম বাংলার হামড়া অঞ্চল প্রধান শ্রী পি, কে রায়ের কথা, যিনি অকাতরে প্রচুর খাদ্য, তাঁবু এবং নগদ অর্থসহ বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। এক সময়ে এই বাংলার ফরিদপুরবাসী পি, কে রায়ের চোখে দেখেছি মমতাপূর্ণ অনুভূতির স্পষ্ট ছাপ। ছিলেন হাবড়ার স্যামুয়েল সরকার। তিনি প্রাণভরা উচ্ছ্বাস-আবেগ নিয়ে এক এক সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দূরবস্থা দেখে কেঁদেই দিতেন। ট্রাক বোঝাই করে খাদ্যদ্রব্য, তাঁবু টারপলিন নিয়ে হাযির হতেন মুক্তিযুদ্ধের শিবিরে। ছিলেন দক্ষিণ ভারতের মিঃ মনু ভাই বিমানী। চার্চিলের মত একখানা দেহ টেনেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের শিবিরে শিবিরে ছায়ার মতোই ঘুরে বেড়াতেন সাহায্য-সহযোগিতা সহকারে। আরো দেখেছি ডঃ ত্রিগুণা সেনকে, অরুণা আসফ আলীকে, ব্যারিষ্টার জে,পি মিটারকে এবং শিশির বোসসহ আরো অনেক খ্যাতনামা ভারতীয় সন্তানদেরকে, যারা উন্মাদের মতই ছুটে ফিরতেন মুক্তিযুদ্ধের এক শিবির থেকে অপর শিবিরে। তাঁদের চোখে মুখে আমি যে অব্যক্ত বেদনা এবং উদ্বেগ প্রত্যক্ষ করেছি, তার শতকরা একভাগ পরিমাণও বেদনা বা উদ্বেগ আমি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চেহারায় দেখতে

পাইনি। পশ্চিম বাংলার সি,পি,এম নেতা শ্রী জ্যোতি বসুর সাথে সাক্ষাৎকালেও আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি গভীর উদ্বেগ। কিন্তু সে ধরনের উদ্বেগ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থিত-আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ভোগরত চেহারায়। নেতৃত্বের এই সীমাহীন দায়িত্বহীনতা এবং সচেতন প্রতারণামূলক আচরণ মুক্তিযোদ্ধাদের ভোগান্তি অনেকগুণে বৃদ্ধি করেছে। তাঁরা সচেতনভাবেই যেমন এড়িয়ে চলেছেন মুক্তিযুদ্ধের শিবিরগুলো, তেমনিভাবেই এড়িয়ে চলেছেন শরণার্থী শিবিরগুলো। তবে মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদের নামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন সম্পদশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সংস্থাসমূহ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থসম্পদ মালামাল সংগ্রহ করেছেন একথা সকলেরই জানা। কিন্তু সংগৃহীত সাহায্যের যৎকিঞ্চিত ব্যতীত আর কিছুই পৌঁছেনি মুক্তিযোদ্ধা কিম্বা শরণার্থী শিবিরে। সে সংগৃহীত অর্থে ভারতের বিভিন্ন ব্যাংকে আওয়ামী লীগ নেতাদের নামে বেনামে মোটা অংক যে জমা হয়েছিল তার ইতিহাস ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মোটেও অজানা নয়। যুদ্ধরত অবস্থায় দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের মুখোমুখি হতে দেখেও যারা ভারতের মাটিতে ভাগ্যোন্নয়নে মত্ত ছিলেন, তারাই যখন আবার মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দাবী করেন, তখন ইতিহাস হয়তো বা মুচকি হেসে প্রচণ্ড কৌতুক বোধ করে বলে আমার বিশ্বাস। শরণার্থী শিবির থেকে অসহায় হিন্দু মেয়েদের কোলকাতা শহরে চাকরী দেয়ার নাম করে সেই সকল আশ্রয়হীনা যুবতীকে যারা কোলকাতার বিভিন্ন হোটেলে এনে যৌনতৃষ্ণা মেটাতে বিবেক-দংশন বোধ করেননি তারা বাঙালী মুক্তিযুদ্ধের নেতা হবেন না তো হবে আর কে বা কারা! হানাদার পাক বাহিনীর সুযোগ্য উত্তরসূরী তো একমাত্র তারাই– আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ!

ভারত সত্যি সত্যিই বিশ্বস্ত বন্ধু! তা না হলে আওয়ামী লীগ নেতাদের এতো কুকর্মের খতিয়ান, দোষ-ত্রুটি, আয়েশের খবর জেনেও আজ পর্যন্ত সামান্যতম প্রকাশ করেনি বরং সাধ্যমত গোপন রেখেই যাচ্ছে– এটা একেবারে কম কথা নয়! হাদীস মতে, অপরের দোষ-ত্রুটি নাকি প্রকাশ্যে

বলতেও নেই, বন্ধু ভারত হাদীসটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে দেখা যায়।

ভারতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবির চলাকালীন অবস্থায় এ ধরনের আরো বহু হাদীস ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত আনুগত্যের সাথেই মেনে চলেছে বলেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এতো সব পাপের বোঝা মাথায় নিয়েও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দাবী করতে মোটেও লজ্জা বোধ করছে না। লজ্জার বালাই তাদের নেই, তাদের বুকভরা রয়েছে ঈর্ষা।

ভারতের মাটিতে অবস্থিত ট্রেনিং শিবিরগুলোর কর্তৃত্ব সেক্টর কমাণ্ডারদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল বলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে বিরাজ করেছে প্রচণ্ড জ্বালা এবং ঈর্ষা। অবশ্য কিছু কিছু এম, পি এবং এম, এন, এ-দেরকে মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং শিবিরে রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু এ ধরনের দায়িত্ব পালনে অনেকেই উৎসাহ প্রদর্শন করেননি। আমার নবম সেক্টরে বাগেরহাটের এম, এন, এ, জনাব শেখ আজিজকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হলেও তিনি কলকাতার আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে বর্ডার এলাকায় কখনো পদধূলি দেয়ার প্রয়োজনও মনে করেননি। ঠাঁট-বাটের পুরুষ শেখ আজিজ সাহেব মনে-প্রাণে হয়তো মন্ত্রীত্বই কামনা করেছিলেন, সেক্ষেত্রে বিনে পয়সায় উপদেষ্টাগীরি তার মর্জি মাফিক হয়নি। পরবর্তীতে খুলনার সালাউদ্দীন ইউসুফকে ঐ একই পদে নিয়োগ করা হলে তিনি অবশ্য সীমান্ত এলাকায় এসে সপরিবারে বসবাস করেন এবং সাধ্যমত অবদান রাখারও চেষ্টা করেছেন। সাতক্ষীরার এম,এন,এ, আবদুল গফুর সাহেব যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন এবং নিবেদিতচিত্তে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য কামনা করেছেন। সাতক্ষীরার তরুণ এম, পি, এ, স. ম. আলাউদ্দীন বেশ তৎপর ছিলেন। সর্বাধিক যার অবদান তিনি ছিলেন বরিশালের জনাব নুরুল ইসলাম মনঞ্জু, মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলো গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে খেটেছেন আমার সাথে। সাতক্ষীরার সীমান্ত অঞ্চল দেবহাটার জনাব শাহজাহান মাস্টার এবং জনাব আতিয়ার রহমানের অবদানও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

সকলের সাহায্য-সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ট্রেনিং শিবিরগুলোতে ট্রেনিং শেষেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটি গঠন করার জন্য ১০ জন থেকে ৩০ জনেরও দল পাঠিয়ে দেয়া হতো। প্রথমে জেলা, মহকুমা, থানা এবং পরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল গেরিলা ঘাঁটি। জুলাই থেকে নভেম্বর প্রকৃতপক্ষে এই পাঁচ মাসের মধ্যেই আমার সেক্টর থেকে সর্বমোট ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং সহকারে দেশে সশস্ত্রভাবে অনুপ্রবেশ করেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে ট্রেনিং শিবির চালু করে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দিয়েছে। মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিল না। তাদেরকে বিশেষ দায়িত্বে অভ্যন্তরে পাঠানো হতো। তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও সরাসরি যুদ্ধেও তারা অংশগ্রহণ করেছে। বাগেরহাটের এম, পি, এ সাহেবের বোন ছাত্রনেত্রী সালেহা বেগম. বরিশালের জয়া, বিথীসহ অনেকেই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

নভেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবিরগুলোর দায়িত্ব সরাসরি নিতে চেষ্টা করে। আমার সেক্টরে ততটা সুবিধা করতে না পারলেও কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার নিয়োগ করেছিল। ট্রেনিং শিবিরের অস্ত্রগুলোও প্রত্যাহার করে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। তখনই শুরু হয় বাকবিতণ্ডা এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটতে আরম্ভ করে। আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করেই অধিকাংশ অস্ত্র বারুদ ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন নৌ-কমাণ্ডো নূর মোহাম্মদ বাবুল, ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর, নৌ কমাণ্ডার বেগের হাতে তুলে দিই এবং তাদেরকে ভারতীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও সজাগ করে দিই। ভারত মুক্তিযুদ্ধে সকল অস্ত্র দিয়েছে একথা সত্য নয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অর্থেও প্রচুর অস্ত্র ক্রয় করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সম্পদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করার কোনই যুক্তি ছিল না।

আসলে ভারত বাংলাদেশে অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করতে চেয়েছিল যাতে তাদের অপকর্মের

বিরুদ্ধে আমরা যেন কোনরূপ সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম না হই। কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে কোন যোদ্ধাই সহজে নিরস্ত্র হতে চায় না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্র তুলে দেব না এই বিদ্রোহের বাণীই সেদিন ছিল আমার মুখে। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই তা করেছিলাম। ভারতীয় কর্মকর্তাগণ আমার দুঃসাহসকে হয়ত মনে প্রাণে সেদিন ঘৃণা করেছেন এবং আমাকে 'উচিত শিক্ষা' দেয়ারও হয়তো পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।

প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেবও আমার সাহসের তারিফ না করে দুর্বল চিত্তে নসিহত করতে ছাড়েননি। কিন্তু দেশ-মাতৃকার মুক্তিযুদ্ধের লড়াকু হিসেবে আমি কারো করুণায় ভর করে বেঁচে থাকার চেয়ে বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করাকে শ্রেয় মনে করেছিলাম। আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থেকে রাতারাতিই অধিকাংশ অস্ত্র, গোলা-বারুদ মোটর-লঞ্চ ভরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিতে সমর্থ হই। সেদিন এই দেশপ্রেমজনক অপরাধের জন্য ভারতের মাটিতেই আমার মৃত্যু হতে পারতো।

কিন্তু একজন ঈমানদার মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ হরণ করার ক্ষমতা কোন জবরদখলকারীর নেই– আল্লাহই ঈমানদারের নিশ্চিত রক্ষক।

•

১৬ই ডিসেম্বর ও ভারতীয় সৈন্যের অনুপ্রবেশ

সশস্ত্র যুদ্ধে জাগ্রত বাঙালী জাতিকে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী প্রথমদিকে স্বাগত জানালেও ধীরে ধীরে তাদের সে উৎসাহে ভাটা পড়ে। বাঙালীর দুর্দমনীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্ফোরণ তাদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাহ্যিকভাবে মৈত্রীর বন্ধন রক্ষা করা গেলেও তাদের অন্তরে ছিল ষড়যন্ত্র আর সন্দেহ। পূর্ব বাংলার বাঙালীদের জাগরণে পশ্চিম বাংলার বাঙালীদেরকেও বিদ্রোহী করে তুলতে পারে এই সন্দেহে এবং ভীতির কারণেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত মুক্তিযুদ্ধ অবসানের ফর্মুলা সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত ছিল। তাদের এই মহান দায়িত্ব পালনে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে যেভাবে গণমানুষের ঢল বর্ডার অতিক্রম করছিল তাতে মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়বে এ আশঙ্কায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী উভয়ই সমানভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্ব উভয়েরই স্বার্থের বিপক্ষে যেতে পারে বলে তারা অনুমান করেছে।

যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্ষমতালোভী আওয়ামী লীগও মুক্তিযুদ্ধের উপরে তাদের পোদ্দারী হারিয়ে বসবে আশঙ্কা করেছে। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়লে তাদের মনে আরও যে ভয়টি দানা বেঁধেছিল তা হলো মুক্তিযুদ্ধের উপর যুদ্ধরত বাঙালী সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার ভয়। এক্ষেত্রেও যুদ্ধবিমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে প্রতিনিয়তই ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর কাছে অনুনয়-বিনয় জানাত মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সরাসরি নেতৃত্ব প্রদানের জন্যে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কৌশলের সাথে পেছন থেকে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছিল এ সত্য যুদ্ধে

অংশগ্রহণকারী কোন মুক্তিযোদ্ধার কাছেই গোপন ছিল না। ভারতীয় বর্ডার ফোর্স বি, এস, এফ,কে সামনের সারিতে নিয়োজিত রেখে সেনাবাহিনী পেছন থেকে সর্বরকম লজিস্টিক সাহায্য প্রদান করা, সর্বরকম তথ্য সংগ্রহ করা এবং সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত ছিল। বস্তুতপক্ষে '৭১-এর আগস্ট মাস থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ-ভারত বর্ডারের সকল অঞ্চলে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিল। এই দীর্ঘ চার মাস ধরেই বর্ডার অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যের বিন্যাস, পুনর্বিন্যাস এবং রণকৌশলগত দিক নিয়ে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপ ঘটেনি বলে যাদের ধারণা, তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর রণকৌশল এবং যুদ্ধ তৎপরতা সম্পর্কে মোটেও অবগত নয়। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ এক ধরনের 'রেকী ফোর্স' হিসেবেই গণ্য করেছে, এর অধিক নয়।

কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটির সম্প্রসারণ এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের সশস্ত্র তৎপরতা ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের মনে যেমন ভীতির সঞ্চার করে, ঠিক তেমনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছেও তা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেশের অভ্যন্তরে 'গেরিলা ঘাঁটিগুলোতে' যুদ্ধরত গেরিলা বাহিনীদের আনুগত্য ক্ষমতালোভী আওয়ামী লীগের পক্ষে দীর্ঘ দিন নাও থাকতে পারে সেই সন্দেহ এবং ভয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনতিবিলম্বে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার মসনদে বসানোর জন্যে বেহায়াপনার সাথে ধরনা দিতে থাকে। আওয়ামী লীগের এহেন আচরণ ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জন্যে সোনায় সোহাগা হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ ভারতীয় চক্র নিজেরাই দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে এক ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করার পরিকল্পনায় রীতিমত মশগুল ছিল। দুর্বল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অসহায় আত্মসমর্পণই ভারতীয় চক্রকে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। অপরদিকে ১৯৭১ সনের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আকস্মিক যুদ্ধ ঘোষণাও ভারতকে বাংলাদেশ অভিযানে সরাসরিভাবে অনুপ্রাণিত করে। এক তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারত

নিঃস্বার্থভাবে বাঙালীদের সুখ-শান্তির জন্য স্বাধীনতা এনে দেবে এ ধরনের ধারণা যারা পোষণ করেন, তারা হয় ভারতের কট্টর সমর্থক না হয় তারা ভারতের কৃপা ভিক্ষাকারীদের মধ্যে অন্যতম। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সাধারণ জনগণ বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার বাঙালী জনগণ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্য এবং নিম্নপদের অফিসারদের বিস্ময়কর মানবতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের সকল কর্মতৎপরতাই যে নিছক হীন স্বার্থভিত্তিক ছিল তা নয়, অসংখ্য ক্ষেত্রেই তাঁর অতুলনীয় মানবতাবোধের প্রমাণ রেখেছেন। যুদ্ধরত অবস্থায় প্রচণ্ডভাবে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টি তাদের সেই মানবতাবোধের স্বাক্ষর এড়িয়ে যায়নি। একথা স্মরণীয় যে, একটি দেশের সাধারণ জনগণের মানবতাবোধের সাথে সে দেশের শাসক চক্রের মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক বা সংগতি নাও থাকতে পারে। ভারত ঠিক তেমনি একটি নমুনা। ভারত আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কই তারা তো সেভাবে 'নাগাল্যান্ড', 'মিজোরাম', 'গুর্খাল্যান্ড' এবং পাঞ্জাবে শিখদের খালিস্তান স্বাধীন করার যুদ্ধে তেমন উদ্যোগ নিচ্ছে না? সে সকল ক্ষেত্রে তো বরং উল্টোটাই সঠিক। নাগা, মিজো, গুর্খা এবং শিখদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সমর্থন নেই কেন? সমর্থনের পরিবর্তে সেখানে ভারতীয় শাসক চক্র শ্বেত-সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে কেন? যে শাসক চক্র নিজের দেশের জনগণের স্বাধীনতা কামনা করে না, তারা কি করে পূর্ব বাংলায় বসবাসরত বাঙালীদের স্বাধীনতা কামনা করতে পারে? এটা কি তাদের উদারতা নাকি তাদের নির্যাতনমূলক প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কাঠামো সম্প্রসারণ করারই উদগ্র বাসনা? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর অভিযানকে উপরিউক্ত আঙ্গিকেই বিচার করতে হবে।

১৯৭১ সনের ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬/১৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করে এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধেও আনুষ্ঠানিকভাবেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই দিনগুলোতে

মুক্তিযোদ্ধারাই সম্মুখের সারিতে যুদ্ধ করেছেন, অকাতরে শহীদ হয়েছে, পঙ্গু এবং আহত হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পেছনে পেছনেই অগ্রসর হয়েছে। তবে এই চৌদ্দ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীরও আনুমানিক ১২ থেকে ১৪ হাজার সদস্য প্রাণ হারিয়েছে। তাদের এই প্রাণ হারানো সার্থক হয়েছে কি? কার স্বার্থে ১৪ হাজার ভারতীয় সৈন্য প্রাণ বিসর্জন দিল? বাংলাদেশের স্বার্থে? কিসের টানে? না, একটি 'মার্সিনারী আর্মির' সদস্যদের কোন স্বার্থ নেই, থাকতে পারে না। তারা কেবল প্রাণ দেয় স্বার্থান্বেষী মহলের নির্দেশে, কোন প্রাণের টানে নয়। জীবন তাদের কাছেও প্রিয়, কিন্তু তবু তা তুচ্ছ, যেহেতু তারা বেতনভুক কর্মচারী। বেতনভুকদের কোন আপন ইচ্ছে নেই, তারা কেবল প্রভুর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটাতে বাধ্য থাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যসহ নিম্নপদবীধারীরা ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসক চক্রেরই সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে কেবল। বাংলাদেশের কোন খালে, কোন বিলে ভারতীয় বাহিনীর কোন সদস্য লাশ হয়ে ভেসে গেছে, সে ইতিহাস কেউ কোনদিন লিখবে না, তবে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে ভারতীয় সেনাপতি জেনারেল অরোরার কাছে পাকিস্তানী সেনাপতি জেনারেল নিয়াজী যে আত্মসমর্পণ করেছে সে ইতিহাস চিরযুগই অম্লান হয়ে থাকবে। বেতনভুক্তদের ইতিহাস লেখা হয় না, তারা ইতিহাস নয়, তারা ইতিহাসের খোরাক মাত্র। ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক অবসানের দিন। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ভারতের পূর্ব অঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। যে যুদ্ধ বাঙালীদের সশস্ত্র গণবিস্ফোরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তার শেষ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কের কাছে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর অধিনায়কের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। হিসেব মিলছে না কেন? হিসেবের এই গরমিলের জন্যে দায়ী কে বা কারা? যারা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল যুদ্ধ শেষে পরাজিত শত্রুপক্ষ সেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল না কেন? পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে তো কোন মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং মুক্তিকামী

বাঙালী জনগণের মধ্যে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের হেতুটি দেখা দিল কেন– কোন উদ্দেশ্যে?

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর কাছে পাকিস্তানের পরাজিত জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলেন না কেন? আত্মসমর্পণের সময় কর্নেল ওসমানী অনুপস্থিত ছিলেন কেন? আত্মসমর্পণের বেশ কয়েকদিন পরে কর্নেল ওসমানী ঢাকায় এলেন কেন? এ সময়কাল তিনি কোথায় ক্ষেপণ করেছেন? তিনি কি তাহলে সত্যিই কোলকাতায় বন্দী ছিলেন? আজো বাংলাদেশের জনমনে নানান প্রশ্নের ভীড় জমছে। এসব প্রশ্নের উত্তর দেশবাসী আওয়ামী লীগের কাছে প্রত্যাশা করছে, কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এ সকল প্রশ্নের জবাব দেয়ার আজ পর্যন্ত কোন তাকিদই বোধ করেনি।

তাছাড়া আত্মসমর্পণের প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে ফিরে এসে বিনা প্রশ্নে গদিতে বসেন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে কেন অনুপস্থিত ছিলেন, সে সত্যটি উদঘাটন করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো না। অথচ মুক্তিযুদ্ধের এই অসহায় মহানায়ক কর্নেল ওসমানীর কতই না প্রশংসা। কেন এই মিছেমিছি প্রশংসা? এর অন্তরালে কি রহস্য? রহস্য তো নিশ্চয়ই রয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কের কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ১৬ই ডিসেম্বর, যাকে আমরা বিজয় দিবস হিসেবে অভিহিত করি, সেই দিন থেকেই বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের 'বিজয় দিবস'–এর পরিবর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'বিজয় দিবস' হিসেবে ইতিহাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করা এবং পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিজয় ঘোষণা করা।

এই বিজয়ে বাংলাদেশের মুক্তিপিপাসু জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধারা ছিল নীরব

দর্শক, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ছিল বিনয়ী তাবেদার এবং কর্নেল ওসমানী ছিলেন অসহায় বন্দী। এ যেন ছিল ভারতের বাংলাদেশ বিজয় এবং আওয়ামী লীগ সরকার এই নব বিজিত ভারতভূমির যোগ্য লীজ গ্রহণকারী সত্তা। সুতরাং যেমন সত্তা তেমনই তার শর্ত– আর যায় কোথায়! এতো গেল ১৬ই ডিসেম্বর সম্পর্কে কিছু কথা।

অনুরূপভাবে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। নবম সেক্টরের অধিপতি হিসেবে আমি সেখানে উপস্থিত থাকলেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষ আমাকে একরকম জোর করেই পেছনের সারিতে ঠেলে দেয়। বার বার প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও আমাকে সামনে আসতেই দেয়া হলো না। আমার প্রতিপক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল দালবীর সিংকে দিয়েই সেই আত্মসমর্পণের নেতৃত্ব বজায় রাখা হয় অথচ দালবীর সিংয়ের অধীনস্থ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময়ই আমার বাহিনীর অনেক পেছনে অবস্থান করত।

মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘ ন'টি মাসের অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং আত্মহুতির মধ্য দিয়ে রচিত বিজয়পর্ব এভাবেই ভারতীয় শাসক চক্র দ্বারা লুণ্ঠিত হয়ে যায়। সংগ্রামী, লড়াকু বাঙালী জাতি প্রাণপণ যুদ্ধ করেও যেন বিজয়ী হতে পারল না, পারল কেবল অপরের করুণায় বিজয় বোধ দূর থেকে অনুভব করতে। বিজয়ের সরাসরি স্বাদ থেকে কেবল বাঙালী জাতি বঞ্চিত হলো না, বঞ্চিত হলো প্রকৃত স্বাধীনতা থেকেই। সুতরাং সেই বঞ্চনাকারীদের কবল থেকে বঞ্চিতদের ন্যায্য পাওনা আদায় করার লক্ষ্যে আর একটি প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন কি এখনও রয়ে যায়নি ?

বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর পরিকল্পিত লুণ্ঠন

১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সূত্র ধরেই যদি বলা যায় তাহলে ১৬ই ডিসেম্বরের পরে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যাপক লুণ্ঠন প্রক্রিয়া ভারত এবং তার তাবেদার গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে তা মোটেও অপরাধযোগ্য ছিল না। কারণ বিজিত ভূখণ্ডে বিজয়ী সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পদ লুটতরাজ করাকে আনন্দ-উল্লাসেরই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়।

স্বাধীনতার উষালগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের সম্পদ লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে যারা উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেন, তারা প্রকারান্তরে এই সত্যটিই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বাংলাদেশ ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি বিজিত ভূখণ্ড মাত্র।

আর যারা ১৬ই ডিসেম্বরকে বাঙালীর বিজয় দিবস এবং বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন সার্বভৌম বলে মনে করেন এবং এ কথাও বলেন যে, স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী কোন সম্পদ লুটতরাজ করেনি, তারা যে বন্ধু ভারতের কোন দোষ ত্রুটিই অনুসন্ধান করতে রাজী নয় এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু যারা দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা, সত্যান্বেষী এবং মুক্তিপিপাসু তারা নিজেদের ভূখণ্ডকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই স্বাধীন করেছে বলে বিশ্বাস করে, তারা বাংলাদেশকে ভারতের বিজিত ভূখণ্ড বলে কখনই মনে করে না। তারা মনে করে ভারতের সম্প্রসারণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে সমগ্র মুক্তিযোদ্ধার ভয়ে ভীত হয়েই বাঙালীর স্বাধীনতার গৌরবকে জবর দখলের মধ্য দিয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করেছে মাত্র। উপরিউক্ত ধ্যান-

ধারণায় পুষ্ট দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ১৬ই ডিসেম্বরের পরে মিত্র বাহিনী হিসেবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ, মালামাল লুণ্ঠন করতে দেখেছে। সে লুণ্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুণ্ঠন, সৈন্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ নয়। সে লুণ্ঠনের চেহারা ছিল বীভৎস বেপরোয়া। সে লুণ্ঠন একটি সচেতন প্রতিক্রিয়ারই ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা। মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের অধিপতি হিসেবে আমি সেই 'মটিভেটেড' লুণ্ঠনের তীব্র বিরোধিতা করেছি– সক্রিয় প্রতিরোধও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। লিখিতভাবেও এই লুণ্ঠনের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন, কর্নেল ওসমানী এবং ভারতীয় পূর্ব অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে জরুরী চিঠিও পাঠিয়েছি। তাজউদ্দীন সাহেবের পাবলিক রিলেশন অফিসার জনাব আলী তারেকই আমার সেই চিঠি বহন করে কলকাতায় নিয়েছিলেন। ১৭ই ডিসেম্বর রাতেই সেই বিশেষ চিঠিখানা পাঠানো হয়েছিল। খুলনা শহরে লুটপাটের যে তাণ্ডব নৃত্য চলেছে তা তখন কে না দেখেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক সেই লুটপাটের খবর চারিদিক থেকে আসা শুরু করে। পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত কয়েক হাজার সামরিক-বেসামরিক গাড়ী, অস্ত্র, গোলাবারুদসহ আরো অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 'প্রাইভেট কার' পর্যন্ত রক্ষা পায়নি, তখনই কেবল আমি খুলনা শহরের প্রাইভেট গাড়িগুলো রিকুইজিশন করে খুলনা সর্কিট হাউস ময়দানে হেফাযতে রাখার চেষ্টা করি। এর পূর্বে যেখানে যে গাড়ী পেয়েছে সেটাকেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সীমান্তের ওপারে।

যশোর সেনানিবাসের প্রত্যেকটি অফিস এবং কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে লুট করেছে। বাথরুমের 'মিরর' এবং অন্যান্য ফিটিংসগুলো পর্যন্ত সেই লুটতরাজ থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি নিরীহ পথযাত্রীরা। কথিত মিত্র বাহিনীর এই ধরনের আচরণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। বাংলাদেশে প্রবেশের সাথে সাথেই যাদের শ্রী এমন, তারা যদি বাংলাদেশ ত্যাগ না করে বাংলাদেশের মাটিতেই অবস্থান করতে থাকে, তাহলে কি দশা হবে দেশ ও জাতির। একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ কোন ধরনের স্বাধীনতা অর্জন করলাম আমরা,

এ ধরনের নানা প্রশ্ন দেখা দিল জনমনে। আমি জনগণ থেকে যেহেতু মোটেও বিচ্ছিন্ন ছিলাম না, সুতরাং ভারতীয় সেনাবাহিনীর আচরণে আমি বিক্ষুব্ধই হয়ে উঠিনি বরং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর্যায়ে চলে গেলাম। খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিলের রেস্ট হাউসে অবস্থানরত আমার প্রতিপক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল দানবীর সিংকে আমি সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'দেখা মাত্র গুলির হুকুম দিয়েছি আমি। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে লুটতরাজ করা হতে বিরত রাখুন।'

জেনারেল দানবীর আমার হুঁশিয়ারবাণী খুবই হালকাভাবে গ্রহণ করে এমন ভাবখানা দেখালেন যেন আমি তারই অধীনস্থ একজন প্রজামাত্র। তার পরের ইতিহাস খুব দ্রুত ঘটে গেছে। খুলনার বিভিন্ন জায়গায়, যশোর বর্ডারে, সাতক্ষীরা-ভোমরা বর্ডারে ভারতীয় লুটেরা বাহিনীর সঙ্গে বেশ কিছু বাদানুবাদ এবং সংঘর্ষও হয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার জন্য আমি ২১শে ডিসেম্বর তারিখ রাত্রে একটা স্টীমার যোগে বরিশাল যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

খুলনা পরিত্যাগ করতে হলে নাকি ভারতীয় সেনাবাহিনী কমাণ্ডের হুকুম নিতে হবে– একথা শোনার পরে ভারতের আসল মতলবখানা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল। আমি সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে ভারতীয় নির্দেশ মেনে চলতে মোটেও বাধ্য ছিলাম না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যূহ ভেঙ্গে দেশ মুক্ত করলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর নির্দেশ মেনে চলার জন্য নয়। একটি মুক্তিপিপাসু জাতির ভাবাবেগ অনুধাবন করতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কেবল চরমভাবেই ব্যর্থ হয়নি, বরং অনুধাবন করার সামান্যতম ধৈর্য্যও প্রদর্শন করেনি তারা। অন্য কথায় তারা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেনি। সংগ্রামী বাংলাদেশ নয়, ভারত যেন একটা মগের মুল্লুক জয় করেছে বলে মনে হলো আমার কাছে। সে যাই হোক, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বাধা-নিষেধের উপেক্ষা করেই আমি দলবলসহ 'ইনভেসটিগেশন' জাহাজটিতে চড়ে ২০শে ডিসেম্বরেই বরিশাল অভিমুখে রওয়ানা হই। বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী ইত্যাদি জায়গাগুলোতে জনসভার আয়োজন

করা হয় এবং জনগণকে ভারতীয় বাহিনীর আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করে দিই। আওয়ামী ছাত্রলীগের যৌথ আয়োজনেই সেই জনসভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সেনা বাহিনীর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অবিলম্বে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করবে এবং সকল অস্ত্র জমা করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে।

ভারতীয় বাহিনীর এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও আমি জনসভাগুলোতে সোচ্চার হয়ে উঠলাম। আমার পরিষ্কার নির্দেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী স্বাধীন বাংলার স্থপতি জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত না করা পর্যন্ত বাঙালী জনগণের মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকবে। শেখ মুজিবের হস্তেই কেবল মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে দেবে।

আমার এই মহান অহ্বান এবং নির্দেশ মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণের মনে ব্যাপক উদ্দীপনার জন্ম দেয়। বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় গোয়েন্দাবাহিনী এবং কট্টর ভারত সমর্থকগোষ্ঠী আমার চেতনা এবং অনুভূতির তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝে উঠতে সক্ষম তো হয়নি বরং ভুল বুঝেছে। এখানে একটা বিষয় সকলেরই পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে স্বাধীনতার সেই উষালগ্নে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সম্পদ রক্ষা করার যে আগ্রহ এবং বাসনা আমরা প্রদর্শন করেছি তা ছিল আমাদের জাতীয় সম্পদ রক্ষা করারই স্বার্থে কেবল, ভারত বিরোধী হয়ে উঠার জন্য নয়। জাতীয় সম্পদ রক্ষার চেষ্টা কেবল নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমেরই লক্ষণ, কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র মোটেও নয়। বন্ধু ভারত এখানে হিসেবে ভুল করেছে আর তাই দেশপ্রেমের পুরস্কার হিসেবে আমাকে যশোর থেকে 'এমবুশ' করে অর্থাৎ গোপনে ওৎ পেতে থেকে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী সশস্ত্র উদ্যোগে গ্রেফতার করে।

আমারই সাধের স্বাধীন বাংলায় আমিই হলাম প্রথম রাজবন্দী। ৩১শে ডিসেম্বর বেলা ১০টা সাড়ে দশটায় আক্রমণকারী বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আসল রূপের প্রথম দৃশ্য দেখলাম আমি। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মদদে বাংলাদেশ স্বাধীন করার অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝে উঠতে আমার তখন আর এক মিনিটও বিলম্ব হয়নি।

১৯৭১ সনের সেই ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটের কথা আমি কোন দিনও ভুলতে পারব না। যশোর সেনা ছাউনির অফিসার কোয়ার্টারের একটি নির্জন বাড়ীতে আমাকে সকাল ১১টায় বন্দী করা হয়। বাড়ী না যেন হানাবাড়ী। ঘুটঘুটে অন্ধকার, আশে-পাশে বেশ কিছু নর-কংকাল পড়ে আছে। ঘরের ভিতর মানুষের রক্তের দাগ। কোন ধর্ষিতা বোনের এলোমেলো ছেঁড়া চুল। বাইরে কাক, শকুন, শেয়াল একযোগে ব্যস্ত। ভেতরে মশারা কামান দাগিয়ে আছে। বাথরুমে পানি নেই। ডিসেম্বরের ভিজে শীত। বাইরে সেন্ট্রির বুটের কটমট আওয়াজ। সারাদিন গেল কোন খাওয়া বা খাবার পানি পর্যন্ত এলো না। ৫ রুম বিশিষ্ট বাড়ীটির রুমে রুমে যেন কান্না আর হাহাকার। সন্ধ্যা হতেই প্যাঁচার গোঙ্গানি শুরু হয়। সহযোগী ভুতুমও পেছনে পড়ে নেই। বাড়ীটার একটা রুমেও লাইট নেই। একটা খাটের উপরে একটা আধছেঁড়া কম্বল এবং তখন সেটাই আমার আপন একমাত্র আশ্রয়স্থল। কোনমতে কম্বলটা জড়িয়ে বসে আছি। রাত ১২টা ১ মিনিটে যশোর সেনাছাউনি নতুন বছরের উজ্জীবনী গীতিতে মুখর হয়ে উঠল। নারী-পুরুষের যৌথ কণ্ঠের মন মাতানো সংগীত নাচ, হাত তালি, ঘুঙুরের ঝনঝনানি, উল্লাস, উন্মাদনা সবই ভেসে আসছিল কর্ণকুহরে। আমার মাটিতে প্রথম নববর্ষেই আমি অনুপস্থিত। এ কথা ভাবতেই আমি কানে আর কিছুই শুনতে পেলাম না। শুনলাম কেবল একটা ব্যাঙ্গাত্মক অট্টহাসি। – "রক্ত দিয়ে এই স্বাধীনতা আনলে তোমরা" যার অর্থ দাঁড়ায় কতকটা এরকম।

রাতের ঘুটঘুটে সেই অন্ধকারে আমি সেদিন কম্বল জড়িয়েও ঘেমে উঠেছিলাম, শিহরিয়ে উঠেছিলাম পুনঃ পুনঃ। স্বাধীনতার সতের বছর পরেও আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। অন্ধকারে আজো আমি একইভাবে শিহরে উঠি আর যেন শুনতে পাই– "রক্ত দিয়ে এই স্বাধীনতা আনলে তোমরা।"

স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি ও ইসলাম

আওয়ামী লীগের ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর অন্তরালেই স্বাধীনতা আন্দালনের বীজ লুকায়িত থাকলেও ৬ দফার প্রণেতারা এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এক জিনিস নয়। ৬ দফার অভ্যন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুর ছিল নেহায়েতই প্রচ্ছন্ন এবং আন্দোলনের ধাপে ধাপে সে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পরিকল্পনা হয়ত বা ছিল। তবে আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কখনো স্বাধীনতার আন্দোলন হিসেবে সচেতনভাবে মনে করেনি, কিন্তু দেশের সংগ্রামমুখর জনগণ ৬ দফার আন্দোলনকে ১ দফার আন্দোলন হিসেবেই যে গণ্য করত এ কথা সত্য। জনগণের কাছে স্বায়ত্তশাসনের দাবীটি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার দাবী হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। পাকিস্তানী শাসক-শোষকের কাছেও ৬ দফা মূলত এক দফারই শামিল ছিল এবং সে কারণেই তারা ৬ দফাকে '৭০-এর নির্বাচনের পরেও মেনে নিতে চায়নি। এটা কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর নিছক অনীহাই ছিল না, এটাই ছিল তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত– যার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে '৭০-এর সেই ভয়াল ২৫শে মার্চ রাতে। মরহুম জননেতা জনাব আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র আগেভাগেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই ১লা মার্চ তারিখেই তাঁর পল্টন ময়দানের জনসভায় জনগণের কাছে ১ দফা ঘোষণা করেছিলেন। সেই জনসভায় 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' এই শ্লোগানটিই প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশ হিসেবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্ন সচেতন বাঙালীদের মধ্যে অবশ্যই বিরাজ করছিল। তবে সেই স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা কি হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা তাদের মধ্যে ছিল না। জনাব

সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সচেতন ক্ষুদ্র একটি অংশ বিশেষ বামপন্থী সংগঠনসমূহের চিন্তা চেতনায় পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে স্থির ছিল সে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। স্বাধীনতা অর্জনের পরে উক্ত চেতনাকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসেবে জাতির উপর আরোপিত করা হয়েছে। যদিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক, সামাজিক শক্তিসমূহ এবং সংগ্রামী জনগণ উক্ত চেতনা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিফহাল ছিল না। তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ কিংবা প্রতিক্রিয়া মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ছিল না বলে মুষ্টিমেয় লোকের চেতনাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসেবে পরিচিত এবং গ্রহণ করানোর সকল প্রয়াসই আজ নিষ্ফল রূপ ধারণ করছে। সঠিক এবং আদর্শিক চেতনাহীন '৭১-এর যুদ্ধটিই প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের রূপ না নিলেও এটি যে নিঃসন্দেহে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল এ বিষয়টি দিবালোকের মতই উজ্জ্বল। সত্য জনগণের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার আবেগ-অনুভূতি, সত্য তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সক্রিয়তা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আন্তরিকতা। এ সত্যগুলো কোন অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে মোটেই মিথ্যা কিংবা ভুলে রূপান্তরিত হতে পারে না। বিদেশী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং সতর্কতা অবলম্বন করার অর্থ এই নয় যে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও অনুভূতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা কিংবা তা অস্বীকার করা। এই হিসেবে যারাই গরমিল করেছে তারাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তবে তাদের এই ভুলের অর্থ বোধ হয় এ দাঁড়ায় না যে, তারা বাঙালী জনগণের সার্বিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল। তারা বাংলাদেশর জনগণের জন্য স্বাধীনতা চেয়েছে কোন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ ব্যতীতই। বিশেষ করে বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারতের হস্তক্ষেপ করাকে তারা স্বাধীনতা নয়, গোলামীরই নতুন এক রূপ হিসেবে বিবেচনা করত। স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধী বলে যারা পরিচিত তারা সকলেই কম-বেশী ভারত বিরোধী হিসেবেই অধিক পরিচিত। এদের ভারত বিদ্বেষী মনোভাব কোন নতুন উপাদান নয়। ভারত

বিভক্তির অনেক পূর্ব থেকেই 'অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস' 'মুসলিম লীগ'-এর মধ্যকার তীব্র দ্বন্দ্বের কারণেই ঐ বিদ্বেষ-এর বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। ইতিহাসের দীর্ঘ জটিল পথ বেয়ে বেয়ে বিদ্বেষের অঙ্কুর মহীরুহে পরিণত হয়েছে এবং আজ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সংঘর্ষের আনুষ্ঠানিক কোন মহড়া না চললেও উপরিউক্ত দল দু'টির সংঘর্ষের ফলে জন্ম নেয়া ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে তা তীব্রভাবেই বিরাজমান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেই বিদ্বেষেরই একটি নতুন বিস্ফোরণ একটি নব সংস্করণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শুরু থেকেই ভারতীয় হস্তক্ষেপ বিদ্যমান ছিল এই সন্দেহে ভারত বিদ্বেষী রাজনৈতিক দলগুলো তাই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়েও যুদ্ধ করেছে এ লক্ষ্যে 'যে কোন মূল্যে দেশ স্বাধীন করতে হবে'। যে কোন মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা যে নিজেদের ভোগের বাইরে চলে যেতে পারে এ ধারণা মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল না। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাহায্য সহযোগিতা স্বাধীনতার রূপ ও স্বাদ পাল্টে দেয়, স্বাধীনতা বিনষ্টও করে দেয় এ সচেতনতা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও ভারতীয় চক্রের মধ্যকার ষড়যন্ত্র সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের জানারও কথা ছিল না। তারা হানাদার বাহিনীকে অত্যাচার করতে দেখেছে, অত্যাচারিত হয়েছে বলেই আত্মরক্ষার্থে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়ে পড়েছে। তাদেরকে আওয়ামী লীগ নেতারা বুঝিয়েছেন 'আগে দেশ, পরে ধর্ম', দেশ রক্ষা করতে না পারলে ধর্মও রক্ষা করা যাবে না। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ধর্ম রক্ষা করার চেয়ে দেশ রক্ষা করার বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে।

অপরদিকে, সাধারণ জনগণও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আসল উদ্দেশ্য জানতে সক্ষম হয়নি। তাদেরকে বুঝানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নাম করে ভারতই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে দখল করে নিতে চায়। মুক্তিযুদ্ধ ভারতেরই একটি গভীর ষড়যন্ত্র মাত্র। ভারত দেশ দখল করে নিলে বাংলাদেশের মাটি থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ধর্মই যদি না থাকে তাহলে দেশ দিয়ে কি

হবে। কাফির হয়ে কাফিরদের অধীনে বেঁচে থাকার চেয়ে ঈমানের সাথে লড়াই করে মুসলমান হিসেবে শাহাদাত বরণ করা অধিক শ্রেয়। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে রাজাকার, আলবদর এবং আশ-শামস হিসেবে অংশগ্রহণকারী সাধারণ যোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করার তুলনায় ধর্ম রক্ষা করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা এ কথা হয়ত বুঝত না যে, নির্যাতনকারীদের পক্ষে যুদ্ধ করে ইসলাম ধর্ম রক্ষা করা যায় না। পুঁজিবাদী পাকিস্তানকে টিকিয়ে রেখে প্রগতি, শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলামকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। পুঁজিবাদের অধীনে পাকিস্তান টিকে গেলেও পুঁজিবাদের বিষবাষ্পে ইসলাম বিকৃত ও পঙ্গু রূপ ধারণ করবে।

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বিপক্ষের সাধারণ যোদ্ধারা উভয় পক্ষের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর কূট প্রোপাগান্ডার শিকারে পরিণত হয়েছে এবং এরই মাঝে অসহায়ভাবে বলির শিকার হয়েছে শান্তিপ্রিয় ধর্মভীরু নিরপেক্ষ জনগোষ্ঠী। উভয় পক্ষেরই সাধারণ যোদ্ধারা সহজ, সরল এবং নির্দোষ। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বিপক্ষের সাধারণ যোদ্ধাদেরকে উপরিউক্ত আলোকেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন করা এবং তার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যকার বিভ্রান্তি দূরীভূত করার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশ ও জাতির ঐক্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ ভবিষ্যত রচনা করার স্বার্থেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থায় উভয় পক্ষের যোদ্ধারা যা কিছুই করেছে তা করেছে স্ব স্ব প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণেই কেবল। বাঙালী হয়ে যারা বাঙালীর ঘরে আগুন দিয়েছে, বাঙালী মা বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতনে শরীক হয়েছে, অহেতুক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তারা যে পক্ষেরই হোক না কেন মানবিক দিক থেকে তারা অপরাধী। অপরাধীদের কোন পক্ষ নেই। অপরাধীদের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, তাদের একমাত্র পরিচয়ই হচ্ছে তারা অপরাধী। অপরাধের বিচার কাম্য– এটা নৈতিক, সামাজিক, মানবিক এবং প্রচলিত আইন-প্রশাসনেরই দাবী। কোন অপরাধের বিনা বিচারে ক্ষমা প্রদর্শন একটি ক্ষমাহীন অপরাধই বটে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রকৃত অপরাধীদের সুযোগ্য বিচারের দাবীতে বাংলাদেশের জনগণ আকুলভাবেই সোচ্চার ছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের চাপে দুর্বল শাসকগোষ্ঠী অসহায়ভাবেই নতি স্বীকার করেছে। তাদের এই নতি স্বীকার করার ফলে প্রকৃত অপরাধীরা হয়ত জীবনে বেঁচে গেছে, কিন্তু দেশ ও জাতি রক্তক্ষরণের হাত থেকে মোটেই নিস্তার পায়নি। তাই স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও স্বাধীনতা আজো তেতো, মুক্তিযুদ্ধ আজ বিকৃত এবং বিস্মৃতপ্রায়।

হানাদার পাকবাহিনী যারা দীর্ঘ ৯টি মাস ধরে বাংলাদেশের বুকে অবলীলাক্রমে গণহত্যা চালিয়ে ইতিহাসের পাতায় এক জঘন্য অধ্যায় সৃষ্টি করল, তাদেরকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কিসের স্বার্থে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ভারতে ? সেই সকল হত্যাকারী গণদস্যুদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হস্তান্তর করা হলো না কেন ? যারা মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশের দরদী সেজে বাঙালীদেরকে উদ্ধার করতে এলো তারাই বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া পাকিস্তানী হত্যাকারী বাহিনীকে নিরাপদ আশ্রয়ে উদ্ধার করে নিয়ে বাঙালী প্রেমের পরিচয় দিয়েছে না পাঞ্জাবী প্রেমের পরিচয় দিয়েছে? মুক্তিযুদ্ধে মৈত্রী বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকারীদের প্রতি অতটা দরদী হয়ে ওঠার পেছনে কারণটা কি ছিল ? রসুনের গোড়া নাকি এক জায়গায়। এ সকল মার্সিনারী আর্মির গোড়াও একই জায়গায়– আমেরিকার পেন্টাগনে। সুতরাং 'মুক্তিযুদ্ধ', 'স্বাধীনতা যুদ্ধ', 'পাক-ভারত যুদ্ধ' ও সকল কিছু না, লৌকিকতা মাত্র। সংগ্রামমুখর জনগণকে বিভ্রান্ত এবং হতাহত করে আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের প্রভাববলয় ঠিক রাখাই হচ্ছে এ সকল 'যুদ্ধ যুদ্ধ' খেলার আসল উদ্দেশ্য। তা না হলে মানবতার খাতিরেও আন্তর্জাতিক মহল থেকেই বাংলাদেশে গণহত্যাকারী পাকিস্তানী নরপশুদের বিচারের দাবী শোনা যেত। না তেমন কিছুই হয়নি, হবেও না যতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মহল অভিশপ্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত না হবে।

নির্যাতিত বাঙালীরাই কেবল বিচারের দাবীতে চিৎকার করেছে। সে চিৎকার কেউ শোনেনি। বাংলাদেশে সংঘটিত ইতিহাসের একটি নারকীয় গণহত্যা বিনা

বিচারেই ধামাচাপা পড়ে রইল। অপরাধের প্রধান নায়করাই যেখানে বিনা বিচারে মুক্ত হলো, সে ক্ষেত্রে প্রধান নায়কদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার বাংলাদেশ সরকারের থাকে কি? সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরশীল কোন সরকারই মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের কোন বিচারই করতে সক্ষম হবে না। তবে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি মনে করি, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ আনার চেষ্টা না করে যাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, তাদের অবশ্যই বিচার হওয়া প্রয়োজন। যতদিন পর্যন্ত অপরাধীদের বিচার না হবে, ততদিন পর্যন্ত জাতি দুর্ভাগ্যজনক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকবে এবং এ কারণে বাংলাদেশের মাটিতে (স্বাধীনতা বিরোধীদের কারণেই) পবিত্র ইসলাম ধর্ম বিরোধী প্রোপাগান্ডার অবসানও হয়ত ঘটবে না। স্বাধীনতা বিরোধী প্রায় সকল দল ও গোষ্ঠী যেহেতু ইসলামভিত্তিক, সেহেতু ইসলামই সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইসলামে কোন অপরাধীরই আশ্রয় থাকার কথা নয়। ইসলাম অন্যায়, অপরাধ বিরোধী এক সক্রিয় জীবন ব্যবস্থা।

ইসলাম অপরাধমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম শোষণহীন, শ্রেণীহীন, সাম্যবাদী সমাজ কায়েম করে। ইসলাম পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, রাজতন্ত্রসহ সকল ধরনের স্বৈরশাসনের ঘোর বিরোধী। ইসলাম মুক্তি এবং শান্তির এক বিপ্লবী ঘোষণা। স্বাভাবিক কারণেই ইসলাম মুক্তিযুদ্ধ চেতনার পক্ষের শক্তি। মানুষের সার্বিক মুক্তির সংগ্রামে ইসলাম প্রতিবন্ধক তো নয়ই, বরং যুগান্তকারী এক সহায়ক শক্তি– মূলশক্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহকে একমাত্র প্রভু ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলাম মানুষকে মূলত স্বাধীন করে দিয়েছে। এই স্বাধীন মানুষের উপর একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব ব্যতীত যে কোন ধরনের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইসলাম আপোসহীন জিহাদ ঘোষণা করে। এমন একটি জীবন দর্শন যা চূড়ান্ত অর্থেই পরিপূর্ণ, সেই ইসলাম সম্পর্কে যারা অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করে, তা তারা অজ্ঞতাবশতই করে বলে আমার বিশ্বাস।

আর যদি কেউ সজ্ঞানেই ইসলাম বিরোধী প্রচারে লিপ্ত হয়, তা তারা করে কায়েমী স্বার্থেরই কারণে কেবল কোন পরামর্শ কিংবা সমালোচনাই তাদেরকে অপপ্রচারের কুৎসিত পথ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় না। তবে অপপ্রচারকারীদের অধিকাংশই যে হচ্ছেন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই ইসলাম এলার্জী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা মানসিক ব্যাধির ন্যায়ই বিরাজ করছে। ইসলামের কথা শোনামাত্রই তারা বিরক্তি ও ঘৃণাভরে কতকটা তোতাপাখীর মতনই কতিপয় শব্দ উচ্চারণ করে বসে– যেমন, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি। বিনা জ্ঞানে কোন কিছু সম্পর্কে মন্তব্য করার স্বভাবটাই যে প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ সে কথা তারা বেমালুম ভুলে যায়। কোন দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতে হলেও যে সেই দর্শন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এখানে একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামে সাম্রাজ্যবাদের রূপ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক এবং ইসলামে বিপ্লবের রূপ হচ্ছে সাম্যবাদ। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রেই আজ ইসলামে সাম্রাজ্যবাদ বিরাজ করছে। একমাত্র ইরানই হচ্ছে এর ব্যতিক্রম। বিপ্লবী গণজাগরণের মধ্য দিয়ে যেমন সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা হয়, ঠিক তেমনি আদর্শিক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ইসলামকেও সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত করতে হবে। আমাদের মত মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামহীন স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে গণমানুষের স্বাধীনতা নয়, ঠিক তেমনি স্বাধীনতাহীন ইসলামও গণমানুষের ইসলাম নয়, তা থেকে যায় 'দরবারী ইসলাম' অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরশীল প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত ইসলাম।

যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে যারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ভূত মাথায় বহন করে এনেছে তারা যেমন ভুল করেছে, ঠিক তেমনি ভুল করেছে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিসমূহ, যারা ইসলামকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে গিয়ে স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করে বসেছে। তাই মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের

জনগণের স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ হতে হবে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রমুক্ত ইসলাম। ইসলামহীন স্বাধীনতা অথবা সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্র নির্ভরশীল ইসলাম সহকারে স্বাধীনতা এর কোনটিই বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুক্তির পথে সহায়ক হবে না। ইসলাম ভিন্ন বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শতকরা ১০ ভাগ মানুষও ধর্মভীরু এবং তারাও ধর্ম সহকারেই স্বাধীনতা এবং মুক্তি কামনা করে। প্রকৃত ইসলামের সাম্যবাদী নীতি এবং ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কোন বিরোধ তো নেই-ই বরং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিধান রয়েছে ইসলাম ধর্মে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দান ইসলাম তো করেই না, অন্যান্য ধর্ম মতেও তদ্রূপ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ ছিল, ধর্মযুদ্ধ ছিলনা। সুতরাং যুদ্ধোত্তরকালে ধর্মের প্রতি উষ্মা কিংবা কটাক্ষ করার কোন যুক্তিই নেই, থাকতেও পারে না। তবুও রয়েছে কেন?

আওয়ামী লীগের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উৎস

১৯৭০ সনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ৬ দফার ভিত্তিতে। এই ৬ দফার মধ্যে আওয়ামী লীগ গৃহীত ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটিরও উল্লেখ ছিল না। তা ছাড়া নির্বাচনী ইশতিহারে আওয়ামী লীগ আরো উল্লেখ করেছিল যে, তারা ইসলাম ধর্ম বিরোধী কোন আইন-কানুনও পাস করবে না। কিন্তু আওয়ামী লীগ '৭২ সনের জানুয়ারীতে ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে দেয় এবং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ নামে রাষ্ট্রের ৪ মূলনীতি নির্ধারণ করে, যা পরবর্তীতে '৭২-এর রাষ্ট্রীয় সংবিধানেও সন্নিবেশিত করা হয়। এই ৪ নীতির মূল উৎস কোথায়? কেনই বা উক্ত ৪ নীতিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো? এ প্রশ্নগুলোর জবাব জনগণ আজো পায়নি।

যে আওয়ামী লীগ '৭০-এর নির্বাচনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন পাস না করার পক্ষে, সেই আওয়ামী লীগই ভারত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গুটিয়ে নিয়ে এসে ক্ষমতার মসনদে বসার সাথে সাথেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করল কেন? স্বেচ্ছাচারী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব স্বেচ্ছাচারমুক্ত হতে পারল না। দেশের জনমতের কোনরূপ তোয়াক্কা না করেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জনগণের উপর জবরদস্তিভাবেই চাপিয়ে দিল।

আওয়ামী লীগ শাসনকালের বিশ্বাসঘাতকতার আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর এখান থেকেই শুরু। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গেলে '৭০-এর নির্বাচনের কথায় ফিরে যেতে হয়। '৭০-এর নির্বাচন ছিল পাকিস্তান কাঠামোর আওতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা জনগণের ম্যান্ডেট লাভ

করেছিল পাকিস্তানের অধীনে। নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অধীনে নয়। সুতরাং '৭২-এর আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংবিধান প্রদান নীতিগত দিক দিয়ে মোটেই বৈধ ছিল না। সমগ্র জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়। অমন একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সপক্ষে যারা ভোট প্রদান করেনি, তারাও দেশ-মাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে শরীক হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছিল আওয়ামী লীগ বিরোধী অথবা আওয়ামী লীগ বহির্ভূত বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ। এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় রূপ ধারণ করেছিল।

কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে আওয়ামী লীগ চরম সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় রূপকে দলীয় রূপ প্রদানের জন্য বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগ বহির্ভূত সকল শক্তি হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের নবতর আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করার সুযোগ থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বঞ্চিত হয়। যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশে যখন জাতীয় ঐক্যের সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই সময়েই আওয়ামীলীগ একলা চলার নীতি অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে জনমত এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করে চলতে থাকে। এসব কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় রাতারাতি ভাটা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের যুদ্ধকালীন দুর্নীতি এবং ব্যর্থতা এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে জনগণের উপর স্বৈরতান্ত্রিক নির্যাতন জনগণ থেকে আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্ন করার উপসর্গ সৃষ্টি করে।

বস্তুত সেই ভয়ে ভীত আওয়ামী লীগ '৭২-এ জনগণের ম্যান্ডেট নেয়ার চিন্তা থেকে বিরত থাকে। অথচ সংবিধান রচনার পূর্বেই জনগণের তরফ থেকে নতুন ম্যান্ডেট লাভ করা ছিল অত্যাবশ্যকীয়। অতএব, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, '৭২-এ আওয়ামী লীগের এমন কোন বৈধ অধিকার ছিল না যাতে করে তারা দেশ ও জাতির উপর একটি মনগড়া সংবিধান আরোপ করতে পারে। তবুও তারা তা জবরদস্তি করেছে। দেশের জনগণের চিৎকার প্রতিবাদ কোন কাজেই আসেনি।

এটা তাদের দুঃসাহস কিংবা ঔদ্ধত্য ছিল না, আওয়ামী লীগের এই আচরণ ছিল অনুগত তল্পীবাহকের প্রভুর আদেশ-নির্দেশ পালন করার বাধ্যতা বা ব্যস্ততা। কারণ, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশের '৭২-এর সংবিধান প্রণেতা হচ্ছে স্বয়ং দিল্লীর শাসক চক্র। '৭২-এর সংবিধানের উৎস তাই বাংলাদেশের জনগণ নয়, সম্প্রসারণবাদী এবং সাম্প্রদায়িক ভারতীয় শাসক চক্রই হচ্ছে মূল উৎস।

এভাবেই যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষের জন্য অন্নবস্ত্রের পূর্বেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতি মাথায় চেপে বসে। এই চার মূলনীতি আরোপ করার মধ্য দিয়ে দিল্লীর কর্তারা তাদের মূল লক্ষ্যই স্থির রেখেছে কেবল। কারণ ভারতীয় সংবিধানও ৪ মূলনীতির ব্যতিক্রম নয়। তাই বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ সন্নিবেশিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে মূলত ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নীতির গোপন সূত্রে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

কারণ এ যুগে তো আর দেশ দখল করে রেখে অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হয় না, তথাকথিত নীতির জালেই পেঁচিয়ে রাখা হয় কোন দেশকে। শক্তিশালী দেশসমূহ দুর্বল দেশ ও জাতিকে বিভিন্ন চুক্তি এবং শর্তে আবদ্ধ করে রাখে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যই ছিল বাংলাদেশকে এমন কিছু দাসত্বমূলক চুক্তি এবং শর্তের মধ্যে বন্দী করে রাখা। '৭২-এর সংবিধান সেই সকল দাসত্বমূলক চুক্তির মধ্যে একটি এবং অন্যতম শর্ত।

এবার তাহলে দেখা যাক, '৭২-এর প্রণীত সংবিধানের ৪ মূলনীতি বাংলাদেশের বাস্তবতার সাথে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথমে গণতন্ত্র। এখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথাই বলা হয়েছে। পশ্চিমা ধাঁচের এই 'সংসদীয় গণতন্ত্র' বাংলাদেশের বাস্তবতার মুখে কেবল অচলই নয়, স্বৈরতান্ত্রিকও বটে। 'সংসদীয় গণতন্ত্র' পুঁজিবাদের রাজনৈতিক শ্লোগান। এই সংসদীয় গণতন্ত্র পুঁজিবাদ প্রবর্তিত আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোকে বহাল তবিয়তে টিকিয়ে রাখার

মূলমন্ত্র। শোষণ-জুলুমভিত্তিক সমাজ কাঠামোই হচ্ছে পুঁজিবাদের ভিত্তি। সম্পদের ব্যক্তি মালিকানায় বিশ্বাসী পুঁজিবাদ তার চরিত্রগত শোষণ-জুলুম অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রবর্তন করেছে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো। এই শোষণমুখী আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোয় যাতে কেউ কোনরূপ অনিষ্ট সাধন না করতে পারে তার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র একটি মোক্ষম ফাঁদ সৃষ্টি করেছে যার নাম 'সংসদীয় নির্বাচন'। সংসদীয় নির্বাচনের কাজই হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোকে 'নিউ লীজ অব লাইফ' প্রদান করা, অর্থাৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমলাতান্ত্রিক নতুন জীবন দান করা। এভাবেই সংসদীয় গণতন্ত্র সংসদীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদভিত্তিক শাসন-জুলুমমুখী আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোকে ধারাবাহিকভাবে টিকিয়ে রাখে। অন্য কথায়, সংসদীয় গণতন্ত্র পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের ভিতকেই কেবল টিকিয়ে রাখেনা, উত্তরোত্তর মজবুতও করে তোলে।

এছাড়াও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পদশালীদেরকেই আইন প্রণয়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিত্ব অর্জনে সাহায্য করে। সংসদীয় গণতন্ত্র হচ্ছে বিত্তবানদের গণতন্ত্র, বিত্তহীনদের গণতন্ত্র নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন প্রণয়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে বিত্তবান শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থ এবং মরযীমাফিক নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং আইন ভঙ্গেরও বেপরোয়া ক্ষমতার অধিকারী হয়। সমগ্র প্রশাসনই বিত্তবানদের অনুগত তাবেদার হয়ে থাকে। এই ধরনের সমাজ কাঠামোতে কোটি কোটি বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষের যেখানে কর্মসংস্থান হয় না, তারা খুঁজে পায় না এক মুঠো অন্ন, সে সমাজেই মুষ্টিমেয় বিত্তবানদের কাছে জমে ওঠে সম্পদের পাহাড় এবং দারুণ স্বেচ্ছাচারিতার সাথে তারা বিভিন্ন আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস এবং অনুৎপাদক কর্মকাণ্ডে বেশুমার অর্থ-সম্পদ অপচয় করে বেড়ায়। সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজ্যে এ সকল বিত্তবানের জন্য আইন থাকে নীরব এবং অন্ধ। কারণ আইনের মালিকও তারা।

সংসদীয় গণতন্ত্র এমন একটি 'মনোহরিণী ডাইনী' যা মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং বিত্তহীনদেরকে সংসদীয় নির্বাচনের রঙিন ফানুস উড়িয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা

দখল এবং শেয়ার করার জন্য অব্যাহতভাবে প্রলুব্ধ করে বেড়ায়। কিন্তু বিত্তহীনরা আশায় আশায় নিরর্থক ঘুরতেই থাকে কেবল। মরুভূমির ক্লান্ত পথিকের ন্যায় বিত্তহীনরাও 'সংসদীয় গণতন্ত্র' নামক মরীচিকাটির পেছনে ছুটতেই থাকে। গণতন্ত্র বিত্তহীনদের কাছে ধরা দেয় না।

কোটি কোটি মানুষকে ভুখা নাঙ্গা এবং অবহেলিত রেখে পুঁজিবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজে মুষ্টিমেয় বিত্তবানের হাতে যাবতীয় সম্পদ এবং উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা কেন্দ্রীভূত করে– এটাই পুঁজিবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি রাজনৈতিক দর্শনকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রথম স্তম্ভ করার মধ্য দিয়ে জনদরদী, দেশদরদী নামে পরিচিত শেখ মুজিব এবং তার আওয়ামী লীগ কিভাবে বাংলাদেশের কোটি কোটি দুঃস্থ, শোষিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন? পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামো বহাল রেখে যারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত নির্যাতিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখেন, কিংবা ওয়াদা করেন, তারা হয় অজ্ঞ না হয় তারা চরম প্রতারক।

এতো গেল আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রণীত ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রথম স্তম্ভ সম্পর্কে কিছু কথা।

এবারে ৪ মূলনীতির দ্বিতীয় শুম্ভকে আলোচনায় আনা যেতে পারে। দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে সমাজতন্ত্র। ভাল কথা। সমাজতন্ত্রের বিস্তারিত সংজ্ঞা দেয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদ বিরোধী দর্শন। বস্তুবাদভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক দর্শন পুঁজিবাদের কবর রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করার মধ্য দিয়ে যেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সেক্ষেত্রে একই রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী দর্শন এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শন একই সঙ্গে কি করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের দাপটে বাঘ–মহিষকে যেমন একঘাটে জল খাওয়ানোর চেষ্টা চলেছে, ঠিক তেমনি হয়ত পুঁজিবাদ এবং বেচারা সমাজতন্ত্রকে একইভাবে একই ঘাটের জল গিলানোর অপচেষ্টা চলেছিল আর

কি! উপরিউক্ত দু'টি দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন সম্পর্ক রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উৎপাদন যন্ত্রের ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক সম্পর্কের অধিকারী হচ্ছে পুঁজিবাদ। আর, উৎপাদনযন্ত্রের সমষ্টিগত কিংবা রাষ্ট্রীয় মালিকানাভিত্তিক সম্পর্কের অধিকারী হচ্ছে সমাজতন্ত্র। প্রথমটি ব্যক্তির হাতে অর্থ-সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে আর দ্বিতীয়টি সমষ্টির মধ্যে অর্থ-সম্পদের বন্টন করে এবং উৎপাদন যন্ত্রের ব্যক্তি-মালিকানার ভিত সম্পূর্ণভাবেই উপড়ে ফেলে। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এবং বৈরী সম্পর্কের এই দু'টি দর্শনকে কোন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী বিশেষের জনপ্রিয়তার দাপটে বাঘ-মহিষের মত একই ঘাটে জল গিলানো সম্ভবই নয়। কিন্তু কেউ যদি তা সম্ভবে পরিণত করার প্রয়াসও চালায়, তাহলে অবশেষে একই ঘটনার অবতারণা ঘটবে যা মুজিবকে কেন্দ্র করে ঘটেছে ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ সনে। পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক ঠাট্টা-তামাশার সম্পর্ক নয়, সে সম্পর্ক হচ্ছে রক্তক্ষয়ী আপোসহীন সম্পর্ক– একে অপরের নিঃশেষের মধ্যে টিকে থাকার সম্পর্ক।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে একই সাথে পুঁজিবাদ প্রবর্তিত সংসদীয় গণতন্ত্র এবং মার্কসবাদ প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র এই দুই বিপরীতমুখী নীতির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব এবং তার আওয়ামী লীগ তাহলে কি লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছিল? আমার মতে তাদের দু'টি প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রথমত সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে রাতারাতি একটি বিত্তবান গোষ্ঠী সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে– সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীনে কোটি কোটি ভুখা-নাঙ্গা মানুষ এবং শিক্ষিত ও বেকার যুবক শ্রেণী ক্রমশ লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার কশাঘাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে যাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দাবীতে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ধাবিত না হতে পারে, সে জন্য কেবল প্রতারণার খাতিরেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে 'সমাজতন্ত্র'কে একটি স্তম্ভ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এটা নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। সমাজতন্ত্র দিয়ে সমাজতন্ত্র ঠেকানোর পুরানো অপকৌশল। চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্র জুড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তাৎক্ষণিক ফায়দা বেশ লুটে নিয়েছে. পাকিস্তানী পুঁজিপতি এবং কিছু কিছু উঠতি বাঙালী পুঁজিপতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

শিল্প, কল-কারখানাগুলোকে বিনা পরিকল্পনায় রাতারাতি রাষ্ট্রীয়করণ করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ মূলত বেপরোয়া লুটতরাজ করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিল। রাষ্ট্রীয়করণ করার নামে আওয়ামী লীগ ঘেঁষা ব্যক্তিকরণ ও গোষ্ঠীকরণ করা হয়েছিল। শিল্প-কলকারখানাসমূহের লুটতরাজের প্রতিযোগিতা বর্বর চেঙ্গিস-হালাকু খানদেরকেও হার মানিয়েছে। শাসক কর্তৃক নিজ দেশের এবং জাতির সম্পদ বেপরোয়া লুণ্ঠনের দৃশ্য জাতি এই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করল। এখানে যে বিষয়টি অত্যন্ত বিস্ময়কর তা হচ্ছে পুঁজিবাদী ভারত বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমাজতন্ত্র উপহার দেবে এমন একটি দূরাশা আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব করলই বা কি করে? আদৌ কি তারা তা করেছে? না করলেও ভারত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গুটিয়ে আনার সময় সমাজতন্ত্রের নামাবলী জড়িয়ে তো তারা এসেছে বাংলাদেশের মসনদে।

এতো রইলো রাষ্ট্রীয় মূলনীতির দ্বিতীয় স্তরের কিছু কথাবার্তা।

এবারে তৃতীয় স্তম্ভটির কিছু রহস্য উদঘাটন করা যাক। আওয়ামী লীগের ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। গভীর ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন বাংলাদেশের জনগণের উপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আরোপ করার বিষয়টিকে মোটেই হালকা করে দেখার কোনভাবে অবকাশ নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বাংলাদেশের জনগণের গভীর ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফ্হাল থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের উপর 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' চাপিয়ে দেয়ার মত এতবড় একটি ভুল পদক্ষেপ নিতে গেল কোন সাহসে? ভারতেরই অনুগত তাবেদার আওয়ামী লীগ সরকারের মাথায় এতবড় একটা ভুলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ভারত কি এভাবে আওয়ামী লীগেরই রাতারাতি ধ্বংস কামনা করেছিল? যদি উপরিউক্ত প্রশ্নের একটিও সঠিক না হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদশের জনগণের উপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চাপিয়ে দেয়ার অন্তরালে ভারতের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? বাংলাদেশের জনগণ কেবল ধর্মপ্রাণই নয়, এ মাটির শতকরা ৯০ ভাগেরও অধিক জনগণ পবিত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারী। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পবিত্র ইসলাম একটি সার্বিক জীবন

সত্তা, কেবল একটি গতানুগতিক ধর্ম নয়। ইসলামভিত্তিক গড়ে ওঠা এই সার্বিক জীবনসত্তা বোধকে রক্ষা করার জন্য এদেশের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রতিবেশী ভারত এ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কোন কারণই নেই। এতো কিছু অবগতির পরেও ভারত আজ্ঞাবহ আওয়ামী লীগকে বাধ্য করেছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা বহন করতে। এর স্পষ্ট জবাব হচ্ছে ভারত মোটেই ভুল করেনি। আওয়ামী লীগের উপর ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দিয়ে ভারত আওয়ামী লীগেরও সর্বনাশ কামনা করেনি। ভারতের হিসেবে বিন্দুমাত্র ভুল নেই। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতের প্রধান শত্রুকে ভারত চিহ্নিত করতে মোটেও ভুল করেনি। দর্শনগতভাবে মার্কসবাদভিত্তিক সমাজতন্ত্রও তাদের শত্রু, কিন্তু সে শত্রু তেমন জোরালো নয়। সে শত্রু আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে শূন্য এবং রাজনীতিগতভাবে দুর্বল। ভারতীয় পুঁজিবাদের দাপট এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতার জোর দিয়ে তারা সমাজতন্ত্র নামক শত্রুটির শ্বাসরুদ্ধ করে রাখতে সক্ষম হবে।

কিন্তু যে শত্রুটির ভয়ে তারা প্রকম্পিত তাকে তো পুঁজিবাদ, কিংবা পৌত্তলিকতাবাদ ভিত্তিক ঠুনকো আধ্যাত্মিকতার জোরে কোনক্রমেই বশ করা যাবে না। তৌহিদবাদভিত্তিক পবিত্র ইসলামই হচ্ছে ভারতের প্রধানতম ভীতি। ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নীতি-নৈতিকতা. ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি, মূল্যবোধ এবং আশ্চর্যজনক আধ্যাত্মিকতার সম্মুখে ভারত যে কোন এক সময় নিরুপায় হতে বাধ্য হবে সে তত্ত্ব ও রহস্য আমরা অনুভব করতে সক্ষম না হলেও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক-বাহক ভারতীয় শাসকচক্রের মোটেও অজানা নয়। বিশাল ভারতের বিভিন্ন সংকটের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংকট হচ্ছে একটি অন্যতম প্রধান সংকট। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত নীতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করলেও ভারতীয় সমাজ জীবনের বুনোট এখনো হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের অভিশপ্ত বর্ণবৈষম্যের প্রভাবমুক্ত মোটেও নয়। হিন্দু ধর্মের এই বর্ণবৈষম্য অথবা 'জাত ও শ্রেণী' ভেদ-এর কারণে প্রায়শই ভারতের বুকে যে

উদগীরণ ঘটে. তা আগ্নেগিরির লাভার চেয়েও ধ্বংসাত্মক। এ ধরনের উদগীরণ ভারতীয় জীবনের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ছক তছনছ করে দেয়। ভারতের ৭৫ কোটি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ভারত হিন্দু ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা না করে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' অবলম্বন করতে বাধ্য হলো কেন? কারণটা সহজ। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চাপের মুখে ভারতকে যদি ১৯৪৭ সালে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হতো তাহলে তাতে আপত্তির কিছুই থাকতো না। কিংবা ভারতে বসবাসরত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তেমন কিছু করারও থাকত না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ তাতে বরং খুশীই হতো। কিন্তু তা করা হয়নি কেবল আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। কারণ ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হলে ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারত। ভারতের বাইরে কোন হিন্দু রাষ্ট্র নেই, তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধু হিসেবে সহজে কাউকে নীতিগতভাবে পেত না। দ্বিতীয়ত, ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হলে ভারতের আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক সংকট তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত এবং সে কারণেই ভারত জাতীয়ভাবে থাকত বিধ্বস্ত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হয়ে পড়তো বন্ধুহীন। এই দ্বিমুখী সংকট উত্তরণের লক্ষ্যেই ভারত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজকে নাখোশ করেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকেই রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য থেকেছে। ভারতীয় শাসকচক্র এ কথা ভাল করেই জানে যে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের জাত-শ্রেণীভেদের বিষবাষ্প কেবল তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' ঘোষণার প্রলেপ দিয়ে মুছে ফেলা যাবে না। তবু তো বাহ্যত চক্ষুলজ্জা থেকে কিছুটা হলেও নিস্তার পাওয়া গেল। দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুধর্মের জাত-শ্রেণীভেদের অনলে দেশ ও জাতি ঝুলতে থাক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-এর আনুষ্ঠানিক লেবাস দিয়ে বন্ধু সন্ধানে তো কোন বেগ পেতে হবে না। ভারতের 'ধর্মনিরপেক্ষ' হওয়ার মূল ব্যাপারটা এখানেই। তবে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' আড়ালে ভারত যে একটি সাম্প্রদায়িক হিন্দুরাষ্ট্র এ সত্য আজ বিশ্বে কার না জানা?

এই হিন্দু-ভারত হিন্দু ধর্মের জাত-শ্রেণীভেদের বিপরীতে ইসলামী সাম্যবাদকে যমের মতই ভয় পায়। ভয় তো পাওয়ারই কথা, কারণ জাত-শ্রেণীভেদের কঠিন অভিশাপের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষ বিদ্রোহ যে একদিন করবেই তা ধ্রুব সত্য এবং ইসলামের সাম্যবাদী নীতি ভারতের নির্যাতিত মানব গোষ্ঠীকে আকস্মিকভাবেই ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করতে পারে। বাংলাদেশের ১১ কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১০ কোটিই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের অনুসারী।

তাছাড়া, বাংলাদেশে বিস্ময়কর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। বাংলাদেশের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা নেই বলেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কখনই নির্যাতিত কিংবা সামাজিকভাবে সংকটাপন্নও হচ্ছে না। তেমন একটা কিছু হলেও না হয় আধিপত্যবাদী ভারতীয় চক্র বাংলাদেশের উপর সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার একটা সুযোগ লাভ করত। তেমন তো কোন সুযোগ নেই, কিন্তু বাংলাদেশের উপর ভারতের কর্তৃত্ব কোন না কোন উপায়ে তো প্রতিষ্ঠা করতে হবেই। বাংলাদেশের উপরে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনের তেমন কোন প্রয়োজন পড়বে না। সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বাংলাদেশের উপর অটোম্যাটিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে যাবে। বাংলাদেশের মূল সংস্কৃতি হচ্ছে ইসলামভিত্তিক, কারণ ইসলামই হচ্ছে শতকরা ৯০ ভাগ জনগণের ধর্ম এবং এই ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন। তাই ইসলাম ধর্মের গভীর আবেগ-অনুভূতির শিকড় থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে প্রয়োজন এমন একটি দর্শন, যা মানুষকে ইসলাম ধর্মের কঠিন অনুশাসন মেনে চলার পথে নিরুৎসাহিত করে তুলবে। অপরদিকে, তরুণ-যুবক শ্রেণীকে প্রলুব্ধ করবে এক বাঁধনহারা জীবনযাপনের ফাঁদে পা দিতে। ধীরে ধীরে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপস্থিতি তরুণ-যুবক শ্রেণীকে বেপরোয়া আরাম-আয়েশ, ভোগপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন পদ্ধতির দিকে ঠেলে দিলেই তারা হয়ে পড়বে শিকড়হীন পরগাছার মতন। তাদের আবেগ-অনুভূতি সমাজের গভীরে প্রোথিত থাকবে না বলেই তারা হবে

ভাসমান উচ্ছৃঙ্খল জনগোষ্ঠী। তখন তারা আর ইসলামের ঐতিহ্যে গর্ববোধ করবে না এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। কারণ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তরুণ-যুবকদেরকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে এবং ধর্মীয় অনুভূতি একেবারেই মিটিয়ে দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মহীনতারই লেবাসী নাম। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে বস্তুভিত্তিক দর্শনের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্তভাবেই বস্তুকেন্দ্রিক এবং অধিবিদ্যামুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় স্রষ্টা কিংবা পারলৌকিক কোন শক্তির কোন স্থান নেই, সুতরাং ধর্মের ও কোন স্থান নেই। মুসলিম তরুণ-যুব গোষ্ঠী এই নাস্তিক্যবাদী তত্ত্বে প্রভাবিত হলে তারা স্বেচ্ছায়ই ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে উঠবে এবং তাহলেই ভারতীয় শাসক চক্রের গোপন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে যায়– অর্থাৎ বাংলাদেশের উপর ভারতীয় সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি সুকৌশল ঠাণ্ডা যুদ্ধ। ভারত তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জুড়ে দিয়ে মোটেও ভুল করেনি, অথবা নিছক লক্ষ্যহীনভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জুড়ে দেয়নি।

এতো গেল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতির তৃতীয় স্তম্ভ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

সর্বশেষে আসে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে জাতীয়তাবাদ জুড়ে দেয়ার পেছনেও ইসলাম বিদ্বেষী মতলব রয়েছে। কারণ জাতীয়তাবাদও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ–এর ন্যায়ই জাতিকে ধর্মবিমুখ করে তুলতে সহায়তা করে এবং ভাষা, কৃষ্টি এবং জাতীয় ঐতিহ্যভিত্তিক মনমানসিকতা গঠন করে। এহেন মনমানসিকতা মানুষকে অহেতুক অহঙ্কারী করে তোলে এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে জাত্যাভিমান হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম দেয়। এই জাত্যাভিমান ইসলামী সাম্যবাদী চেতনার পরিপন্থী। তাছাড়া 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম জনগণের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণার প্রতিফলনও সঠিক অর্থে ঘটায়। বাংলাদেশের মুসলিম বাঙালী এবং পশ্চিম বাংলার হিন্দু বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনার উৎসস্থলকে এক ও অভিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নেই। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের রূপ বাহ্যত

এক মনে হলেও সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস বিপরীতমুখী। স্বাধীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস হচ্ছে 'তৌহিদবাদ', যা ইসলাম ধর্মভিত্তিক। অপরদিকে পশ্চিম বাংলার জনগণের সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস হচ্ছে 'পৌত্তলিকতাবাদ', যা হিন্দু ধর্মভিত্তিক। সুতরাং 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' পশ্চিম বাংলার বাঙালী ভাই-বোনদেরকে যতটা অনুপ্রাণিত করবে, বাংলাদেশের মুসলিম বাঙালীকে ততটা অনুপ্রাণিত করবে না। কারণ, 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের' সাংস্কৃতিক চেতনায় পৌত্তলিকতাবাদ-এর প্রভাব অধিক। এই দর্শনগত পার্থক্যের কারণে উভয় বাংলার ভাষা, খাদ্য, পোশাকসহ সংস্কৃতির বাহ্যিক দিকের একটি সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিরাজ করছে এক সুকঠিন প্রাচীর, যা কখনো তাদেরকে এক হতে দেবে না 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের' মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীর ভেঙে চুরমার করা সম্ভব হবে না, তবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে সেই প্রাচীর টপকিয়ে হয়ত ওপারের সাথে একাত্ম করা যাবে। কিন্তু তাতে ফল হবে বিপরীত। এপারের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নেবে আজন্ম অবিশ্বাস এবং রেষারেষি। ভারতীয় শাসকচক্র মূলত উভয় বাংলার মধ্যে এই স্থায়ী রেষারেষিই কামনা করে। যার ফলে সবকিছু জেনেশুনেই ভারতীয় শাসকচক্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ৪র্থ স্তম্ভ হিসেবে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে জুড়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী 'মুসলিম বাঙালী' এবং 'হিন্দু বাঙালীর' সংস্কৃতিগত পার্থক্য উপলব্ধি করতে না চাইলেও পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কিন্তু পার্থক্যটা অনেক পূর্ব থেকেই জানেন। এখানে একটা উদাহরণ দিলেই ধারণাটা পরিষ্কার হবে বলে আমার বিশ্বাস। উভয়েই একই হিন্দুধর্মের লোক হওয়া সত্ত্বেও যখন উচ্চবর্ণ হিন্দু নিম্নবর্ণ হিন্দু হরিজনকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করে, সেই উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে মুসলিম বাঙালীদের গ্রহণযোগ্যতা আদৌ থাকতে পারে কি? কেন পারে না? সে উত্তর বাংলাদেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা দিতে লজ্জাবোধ করলেও পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীরা অনেক পূর্বেই সে প্রশ্নের উত্তর যুগে যুগে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই দিয়েছে।

নিজেদের সত্যিকার পরিচয় প্রদান করতে যে জাতি হীনম্মন্যতার শিকার হয়, সে জাতির অস্থি-মজ্জা শুকিয়ে যেতে এক শতাব্দীর অধিক প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই 'সত্তার সংকট এতই তীব্র রূপ

ধারণ করেছে যে, আজ তারা 'নিজ সত্তা' প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত। এ ধরনের আচরণ মুক্তবুদ্ধি কিংবা কোন বাহাদুরীর লক্ষণ মোটেও নয়, বরং এটা হচ্ছে আত্মপরিচয় দানে হীনম্মন্যতা এবং আত্মপ্রবঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ। পরগাছাবৃত্তি প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়। বাস্তবতার স্বীকৃতির মধ্যেই প্রগতি। তাই 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে আমার মতামত বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী আজ এই বাস্তবতারই স্বীকৃতি চায়– কারো কোন করুণা ভিক্ষা করে না। সংক্ষেপে রাষ্ট্রীয় চার নীতির 'পোস্ট মর্টেম' এখানেই শেষ।

আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের '৭২-এর সংবিধানকে যারা দেশ ও জাতির জন্য পবিত্র আমানত বলে মনে করেন, তাদের কাছে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার সবিনয়ে আশ্বাসবাণী দেশ ও জাতির জন্য– আপনারা ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় শাসকচক্রের তরফ থেকে যে সকল পবিত্র আমানত (!) ১৯৭১ সন থেকে বহন করে নিয়ে এসেছেন, তার মালিকানা নিয়ে আপনাদের সাথে বাংলাদেশের তৌহিদী জনগণের কোনদিনই প্রতিযোগিতা হবে না। তবে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ৪ স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারতটির উপর যে একটি নির্ভরশীল এবং স্থায়ী ছাদ নির্মাণের প্রয়োজন ছিল, সে বিষয়টি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কার উপর ছেড়ে দিয়েছিল– ভারত না রাশিয়ার উপর?

জনমত এ বিষয়ে বিভ্রান্ত। ছাদহীন স্তম্ভের উপরে আধিপত্য বিস্তারের উন্মাদশক্তি মাত্রই ছাদ বিছাতে আগ্রহী থাকবে। এটাই তো স্বাভাবিক। হলোও তাই, হচ্ছেও তাই এবং হবেও তাই। আর তাই তো কখনো ভারত, কখনো রাশিয়া এবং কখনো আমেরিকার ইচ্ছামাফিক লীলাখেলা চলছে আমাদের ৪টি স্তম্ভের অভ্যন্তরে।

একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অবুঝের মত কেবল ৪টি স্তম্ভই ধার করলাম, নিরাপদ একটি বাসগৃহ তৈরি করার প্রস্তুতি নিলাম না।

দেশের কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষ এবং তৌহিদী জনগণ আজ সেই নিরাপদ একটি বাসগৃহই কামনা করে, বিদেশী প্রভুদের কাছ থেকে পাওয়া স্তম্ভবিশিষ্ট ইমারত নয়।

“স্বাধীনতা লাভের প্রায় ১৭ বছর পরেও আমাদের কোন অভাব দূর তো হ'লই না, বরং যত দিন যাচ্ছে ততই যেন জাতি হিসেবে আমরা মর্যাদাহীন হয়ে পড়ছি, নিস্তেজ হয়ে পড়ছি। বুক ভরা আশা-স্বপ্ন আজ রূপান্তরিত হয়েছে গ্লানী ও হতাশায়। সম্মান, জাতীয়তাবোধ, মর্যাদাবোধ, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ এ সব কিছুই যেন বিধ্বস্ত। এক কথায়, বিবেক আজ বিভ্রান্ত। সুবিধাবাদ এবং অযোগ্যতার মহড়ায় গোটা জাতি আজ নীরব নিশ্চল অসহায় জিম্মী।”